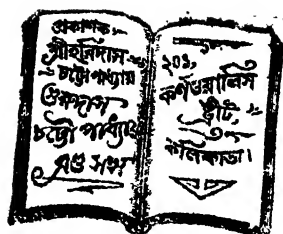


ଆଟି-ଭାବନା-ସଂସ୍କରଣ-ଗ୍ରହଣାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ

## ମଲ୍ଲୀ-ସମାଜ

ଶ୍ରୀମତୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

[ ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୨୭ ]



বর্ষ সংস্করণ  
[ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ]

প্রিন্টার—শ্রীহেমচন্দ্র রায়,  
বিউটী থ্রেস্  
২৪২-১ অপর সারকিউলার রোড,  
কলিকাতা।

কুমুদ

*Sri Kumud Nath Dutta*

14C, KALI KUMAR BANERJEE LANE  
TALA, CALCUTTA-2.

# শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

## গ্রন্থাবলী

১।	বিরাজবো	(ষষ্ঠ সংস্করণ)	...	১।০
২।	বিন্দুর ছেলে	(সপ্তম ,, )	...	১।০
	বড়দিদি	(চতুর্থ ,, )	...	৫০
৪	পণ্ডিত মশাট	(তৃতীয় ,, )	...	১।০
৫	অরক্ষণীয়া	(চতুর্থ ,, )	...	১।০
৬	বৈকুণ্ঠের উইল	(দ্বিতীয় ,, )	...	১।০
৭	মেজাদিদি	(তৃতীয় ,, )	...	১।০
৮	চন্দ্রনা	(চতুর্থ ,, )	...	১।০
৯	পরিণীতা	(ষষ্ঠ ,, )	...	১।০
১০	দেবদাস	(দ্বিতীয় ,, )	...	১।০
১১	শ্রীকান্ত—১ম পর্ব	(তৃতীয় ,, )	...	১।০
১২	শ্রীকান্ত—২য় পর্ব	(দ্বিতীয় ,, )	...	১।০
১৩	কাশীনাথ	(দ্বিতীয় ,, )	...	১।০
১৪	নিষ্কৃতি	(দ্বিতীয় ,, )	...	১।০
১৫	চরিত্রহীন	(দ্বিতীয় ,, )	...	৩।০
১৬	স্বামী	(তৃতীয় ,, )	...	১।০
১৭	মত্তা	(দ্বিতীয় ,, )	...	২।০
১৮	ছবি	(প্রথম ,, )	...	১।০
১৯	গৃহদাহ	(প্রথম ,, )	...	৪।০

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা



## পল্লী-সমাজ

১

বেণী ঘোষাল মুখুযোদের অন্তরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, “এই যে মাসি, রমা কই গা?” মাসী আহ্নিক করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে রান্নাঘর দেখাইয়া দিলেন। বেণী উঠিয়া আসিয়া রন্ধনশালায় চোকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, “তা হ’লে রমা, কি করবে স্থির করলে?” অলস্ত উনান হইতে শকারমান কড়াটা নাশাইয়া রাখিয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিল,—“কিসের বড়দা?”

বেণী কহিলেন, “তারিণী খুড়োর শ্রদ্ধের কথাটা বোন! রক্ষণ ত কা’ল এসে হাজির হয়েছে। বাপের শ্রাদ্ধ খুব ঘটা ক’রেই করবে ব’লে বোধ হচ্ছে;—যাবে নাকি?”

রমা দুই চক্ষু বিশ্বরে বিস্তারিত করিয়া বলিল, “আমি বাবু তারিণী ঘোষালের বাড়ী?” বেণী জীবৎ লজ্জিত হইয়া কহিল—“সে ত জানি দিদি। আর যেই বাক, তোরা কিছুতেই সেখানে যাবিনে। তবে, শুনচি নাকি, ছোঁড়া সমস্ত বাড়ীবাড়ী নিজে গিরে বলবে—বজ্রাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপেরও ওপরে যায়—বলি আসে, তা হ’লে কি বলবে?” রমা সরোষে জবাব দিল,—“আমি কিছুই বোলবো না—বাইরে দরওয়ান তার উত্তর দেবে—” দুঃখান্বিত মাসীর কর্ণরন্ধ্রে এই অভ্যক্তি হৃদিবিরহরসের আলো-রূপা পৌছিযামাত্রই তিনি আহ্নিক কেলির রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন। বোনবির কথা শেষ না হইতেই অজ্ঞাতপথ বৈএর মত দৌঁকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, “দরওয়ান কেন? আমি বলতে

জানিনে ? নচ্ছার ব্যাটাকে এমনি বলাই বলব যে, বাছাধন জন্মে কখন আর মুখুয্যোবাড়ীতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ব্যাটা ঢুকবে নেমতায় করতে আমার বাড়ীতে ? আমি কিছুই ভুলিনি নেণীমাধব ! তারিণী তার এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তখনও ত আর আমার বতীন জন্মায় নি—  
—বুঝলে না বাবা বেণি ! তা যখন হ'ল না, তখন ঐ ভৈরব আচাষিকে দিয়ে কি সব অপতপ তুচ্ছতাক্ করিয়ে মায়ের কপালে আমার এমন আগুন ধরিয়ে দিলে যে, ছ'মাস পেরুল না, বাছার হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর যুচে গেল ! ছোট জাত হ'য়ে চায় কি না বড় মুখুয্যোর মেয়েকে বৌ করতে ! তেমনি হারামজাকার মরণও হয়েছে—ব্যাটার হাতের আগুনটুকু পর্যন্ত পেলো না ! ছোট-জাতের মুখে আগুন !” বলিয়া মাসী যেন কুন্তি শেষ করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ ছোট জাতের উল্লেখে বেণীর মুখ স্থান হইয়া গিয়াছিল, কারণ, তারিণী ঘোষাল তাহারই খুড়া। রমা হহা লক্ষ্য করিয়া মাসীকে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিল, “কেন মাসি, তুমি মামুষের জাত নিয়ে কথা কও ? জাত ত আর কারুর হাতেগড়া জিনিষ নয় ? যে যেখানে জন্মেচে, সেই তার জাত।” বেণী লজ্জিতভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল,—“না, রমা, মাসী ঠিক কথাই বলচেন। তুমি কত বড় কুলানের মেয়ে, তোমাকে কি আশ্রয় ঘরে আনতে পারি বোন ! ছোট খুড়োর এ কথা মুখে আনাই বেগদাদি। আর তুচ্ছতাকের কথা যদি বল, ত' সে সত্যি। ভুলিয়ায় ছোট খুড়া আর ঐ ব্যাটা ভৈরব আচাষির অসাধ্য কাজ কিছু নেই। ঐ ভৈরব ত হয়েছে আজকাল রমেশের মুকাব্ব।”

মাসী কহিলেন—“সে ত জানা কথা বেণি ! ছোড়া দশ বায়ে বচ্ছর ত দেশে আসেনি—এতদিন ছিল কোথায় ?” “কি ক'রে জানব মাসি ? ছোট খুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব.

আমাদেরও তাই। তুচ্ছ, এতদিন নাকি কোম্বই, না, কোথাক ছিল। কেউ বলচে, ডাক্তারি পাশ ক'রে এসেচে, কেউ বলচে, উকিল হ'য়ে এসেচে—কেউ বলচে, সমস্তই ফাঁকি—ছোড়া নাকি পাড় মাতাল! যখন বাড়ী এসে পৌঁছল, তখন চুই চোখ নাকি জবাফুলের মত রাঙা ছিল।” “বটে? তা হ'লে তাকে ত বাড়ী ঢকতে দেওয়াই উচিত নয়।”—বেণী উৎসাহ ভরে মাথার একটা ফাঁকানি দিয়া কহিল—“নয়ই ত! হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে?” নিজের হতভাগ্যের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় রমা মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। সলজ্জ মুহূ হাসিয়া কহিল,—“পড়ে বৈ কি। সে ত আমার চেয়ে বেশী বড় নয়। তা ছাড়া শীতলাওলার পাঠশালা ছজনেই পড়তাম সে। কিন্তু তার মায়েস্বরূপেব কথা আমার খুব মনে পড়ে। খুড়ীমা আমাকে বড় ভালবাসতেন।” মাসী আর একবার নাচিয়া উঠিয়া বলিলেন,—“তার ভালবাসাব মুখে আশুন। সে ভালবাসা কেবল নিজের কান্না হাসিল করবার জন্তে। তাদের মতলবই ছিল, তোকে কোনমতে হাত করা।”

বেণী অত্যন্ত বিজ্ঞের মত সায় দিয়া কহিল, “তাতে আর সন্দেহ কি মাসি! ছোট খুড়ীমাও যে,—” কিন্তু তাহাব বক্তব্য শেষ না হইতেই রমা অপ্রসন্নভাবে মাসীকে বলিয়া উঠিল—“সে সব পুরাণে কথায় দবকার কি মাসি?”

রমেশের পিতার সহিত রমার যত বিবাদই থাক, তাহার জননীৰ সম্বন্ধে রমার কোথায় একটু যেন প্রজ্ঞার বেদন্য ছিল। এতদিনেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। বেণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন,—“তা বটে তা বটে। ছোটখুড়ী ভালমানুষের মেয়ে ছিলেন। মা আজও তাঁর কথা উঠলে চোখের জল ফেলেন।”

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ এ সকল প্রসঙ্গ চাপা দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, “তবে এই ত হির

রইল দিদি, নড়চড় হবে না ত ?” রমা হাসিল। কহিল, “বড়দা, বাবা বলতেন, আগুনের শেষ, ধূণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো বাধিস্থনে না। তারিণী ঘোষাল জ্ঞানন্তে আমাদের কম আলা দেয়নি—বাবাকে পর্য্যন্ত জেলে দিতে চেয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা,—যত দিন বেচে থাকুব, ভুলব না। রমেশ সেই শত্রু বই ছেলে ত। তা ছাড়া আমার ত কিছুতেই যাবার যো নেই। বাবা আমাদের দুই ভাইবোনকে বিষয় ভাগ ক’রে দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় রক্ষা করবার ভার শুধু আমারই উপর যে। আমরা ত নব-ই, আমাদের সংস্রবে যারা আছে, তাদের পর্য্যন্ত যেতে দেব না।” একটু ভাবিয়া কহিল, “আচ্ছা বড়দা, এমন কবতে পার না যে, কোনও প্রাঙ্গণ না তাদের বাড়ী যায় ?” বেণী একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, “সেই চেঁচাই ত করুচি বোন। ভুই আমাব সহায় থাকিস, আর আমি কোন চিন্তে করিনে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারিত অ’মার নাম বেণী ঘোষাল নয়। তার পরে রইলাম আমি, আর ঐ ভৈরব আচায়া। আর তারিণী ঘোষাল নেই; সেখি এ ব্যাটাকে এখন কে রক্ষা করে।” রমা কহিল, “রক্ষে কববে রমেশ ঘোষাল। দেখো বড়দা, এই আমি ব’লে রাখ্লাম, শত্রুতা কবতে এও কম করবে না।” বেণী আরও একটু অগ্রসর হইয়া একবার এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া চৌকাঠের উপর উচু হইয়া বসিলেন। তার পরে কণ্ঠস্থর অভ্যস্ত মুহু করিয়া বলিলেন, “রমা, বাঁশ মুইয়ে ফেলতে চাও ত, এই বেলা। পেকে গেলে আর হবে না, তা নিশ্চয় ব’লে দিচ্ছি। বিষয়-সম্পত্তি কি ক’রে রক্ষে করিতে হয়, এখনও সে শেখেনি—এর মধ্যে যদি না শত্রুকে নিঃশূল করতে পারা যায়, ত ভবিষ্যতে আর বাবে না; এই কথাটা আমাদের দিবারাত্রি মনে রাখতে হবে যে, এ তারিণী ঘোষালেরই ছেলে—আর কেউ নয়।” “সে আমি

বুঝি বড়না।” “তুই না বুঝিস্ কি নিদি! ভগবান্ তোকে ছেলে গড়তে গড়তে খেয়ে গড়ে ছিলেন বৈ ত নয়। বুদ্ধিতে একটা পাঁকা জমিদারও তোর কাছে হটে যায়, এ কথা আমরা সবাই বলাবলি করি। ‘আচ্ছা, কা’ল একবার আসব। আজ বেলা হ’ল যাই—” বলিয়া বেণী উঠিয়া পড়িলেন। রমা এই প্রশংসায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-সহকারে কি একটু প্রতিবাদ করিতে গিয়াই তাহার বৃকের ভিতবে হাঁৎ করিয়া উঠিল। প্রাঙ্গণের এক প্রান্ত হইতে অপবিচিত গম্ভীর-কণ্ঠের আহ্বান আসিল—“রাণী কই রে?” রমেশের মা এই নামে ছেলেবেলা তাহাকে ডাকিতেন। সে নিজেই এতদিন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। বেণীর প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহার সমস্ত মুখ কালীবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই কক্ষমাথা, খালি পা, উস্তরীয়টা মাথায় জড়ানো—রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল। বেণীর প্রতি চোখ পড়িবামাত্র বলিয়া উঠিল, “এই যে বড়না, এখানে? বেশ, চলুন, আপনি না হ’লে করবে কে? আমি সারা গাঁ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! কৈ, রাণী কোথায়?” বলিয়াই কবাটের স্রমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পলাইবার উপায় নাই, রমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রমেশ মুহূর্ত্তমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মহাবিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল—“এই যে! আরে ইন্, কত বড় হয়েছিল রে? ভাল আছিস্?” রমা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কণা কাহিতেই পারিল না। কিন্তু রমেশ একটুখানি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, “চিন্তে পাচ্ছিস্ ত রে? আমি তোদের রমেশ দা!” এখনও রমা মুখ ভুলিয়া চাহিতে পারিল না! কিন্তু যুগ্মকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, “আপনি ভাল আছেন?”

“হাঁ তাই, ভাল আছি। কিন্তু, আমাকে ‘আপনি’ কেন রমা?” বেণীর দিকে চাহিয়া একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া

বলিল, “রমার সেই কথাটি আমি কোন দিন ভুলতে পারিনি বড়দা ! যখন মা মারা গেলেন, ও তখন শু খুব ছোট। সেই বয়সেই আমার চোখ মুড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, ‘রমেশ দা, তুমি কেঁদ না, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব।’ তোর সে কথা বোধ করি মনে পড়ে না রমা, না ? আচ্ছা, আমার মাকে মনে পড়ে ত ?” কথাটা শুনিয়া রমার ঘাড় যেন লজ্জার আরও ফুঁকিয়া পড়িল। সে একটিমাত্র ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে পারিল না যে, খুড়ীমাকে তাহার খুব মনে পড়ে। রমেশ বিশেষ করিয়া রমাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিতে লাগিল—“আর ভ সময় নেই, মাকে শুধু তিনটি দিন বাকী, যা করবার তার দাও তাই, মাকে বলে একাধু নিরাশ্রয়, আমায় এই হৃদয়ে তোমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িও। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্যাপ্তও করতে পারাচ না।”

মাসী আসিয়া নিশ্চয়ই রমেশের পিছনে দাঁড়াইলেন। বেণী স্বপ্নের মতো দেখেই যখন একটা কথাবার্তা জবাব দিল না, তখন তিনি অস্থির হইয়া আসিয়া রমেশের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি বাপু, তারিণী ঘোষালের ছেলে না ?” রমেশ এই মাসীটিকে ইতিপূর্বে দেখেন নাই ; কারণ, সে গ্রামত্যাগ করিয়া যাইবার পরে ইনি রমার জননী অস্থির উপলক্ষে সেই যে মুখুযো বাড়ী চুকিয়াছিলেন, তার বাহির হন নাই। রমেশ কিছু বিস্মিত হইয়াই তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মাসী বলিলেন, “না হ’লে এমন বেহায়া পুরুষমানুষ আব কে হবে ? যেমন বাপ তেমনি বাটা। বলা নেই, কথা নেই, একটা গেরতর বাড়ীর ভেতর ঢুকে উৎপাত করতে গরম হয় না তোমার ?” রমেশ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কাঁঠ হইয়া চাহিয়া রহিল। “আমি চন্দ্রম” বলিয়া বেণী বাস্তব হইয়া সরিয়া পড়িলেন। রমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, “কি বোকা মাসী, তুমি নিজের কাজে যাও না—” মাসী গমে করিলেন, তিসি বোঝার

শ্রদ্ধা ইঙ্গিতটা বুঝিলেন। তাই কঠিনের আরও একটু বিষ  
শিলাইরা কহিলেন, “নে, রমা বকিস্নে। যে কাজ করতেই হবে,  
তাতে আমার তোদের মত চকুলজ্জা হয় না। বেণীর অমন ভয়ে  
পালানো কি দায়কার ছিল? ব’লে গেলেই ত হ’ত, আমরা  
বাগ্নু তোমার গমস্তাও নই, বাসু তালুকের প্রজাও নই যে, তোমার  
কম্বাড়াইতে জল তুলতে, ময়দা মাথতে গাব। তারিণী মরেচে,  
গী শুদ্ধ লোকের হাড় জুড়িয়েচে; এ কথা আমাদের ওপর বসাত  
দিয়ে না গিয়ে নিজে ওব দুখের ওপর ব’লে গেলেই ত পুরুষ-  
মাথুষের মত কাজ হ’ত।” রমেশ তখনও নিষ্পন্দ অসাড়ের মত  
দাঁড়াইয়া রহিল। বস্তুতঃই এ সকল কথা তাহার একান্ত দুঃস্বপ্নেরও  
অগোচর ছিল। ভিত্তর হইতে রান্নাঘরের কবাটের শিকলটা  
ঝনঝন করিয়া নড়িয়া উঠিল। কিন্তু কেহই তাহাতে মনোযোগ  
করিল না। মাসী রমেশের নিকট ও অভ্যস্ত পাণ্ডুবর্ণ মুখের  
এতি চাহিয়া পুনরপি বলিলেন, “যাই হোক, বামুনের ছেলেকে  
আমি চাকর দরওয়ান দিছে অপমান করাতে চাইনে,—একটু হুঁস  
কোরে কাজ কর বাগ্নু,—যাও। কচি ধোকাটি নও যে, ভদ্র-  
লোকের বাড়ীর ভেতর ঢুকে আবদার ক’রে বেড়াবে। তোমার  
বাড়ীতে আমার রমা কখন পা ধুতেও যেতে পারবে না, এই  
তোমাকে আমি খ’লে দিমুম।”

হঠাৎ রমেশ যেন নিদ্রোথিতের মত জাগিয়া উঠিল, এবং  
পরক্ষণেই তাহার বিস্তৃত বকের ভিতর হইতে এমনি গভীর একটা  
নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, সে নিজেও সেই শব্দে সচকিত  
হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর কবাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রমা  
মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। রমেশ একবার বোধ করি ইতস্ততঃ  
করিল, তাহার পরে, রান্নাঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, “বখন  
বাঙরা হতেই পারে না, তখন তার উপায় কি! কিন্তু আমি শু  
এত কথা জান্তাম না—মা জেনে বে উপায় ক’রে গেলান, সে

আমাকে মাপ কেঁরা রাগি!” বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে এতটুকু সাড়া আসিল না। বাহার কাছে কমা-ভিক্ষা করা হইল, সে যে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, রমেশ তাহা জানিতেও পারিল না। বেণী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে পলায় নাই, বাহিরে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। মাসীর সহিত চোখাচোখি হইতেই তাহার সমস্ত মুখ আফ্লাদে ও হাসিতে ভরিয়া গেল, সরিষা আসিয়া কহিল, “হাঁ, শোনালে বটে মাসি! আমাদের সাখিই ছিল না, অমন ক’রে বলা! এ কি চাকর দরওয়ানের কাজ রমা? আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম কি না, ছোঁড়া মুখখানা যেন আবাড়ের মেঘের মত ক’রে বার হয়ে গেল! এই ত—ঠিক হ’ল! মাসী ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে বলিলেন, “খুব ত হ’ল জানি; কিন্তু এই দুটো মেয়েমানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না স’রে গিয়ে, নিজে ব’লে গেলেই ত আরও ভাল হ’ত! আর নাই যদি বলতে পারতে আমি কি বললুম তাকে, দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা? অমন স’রে পড়া উচিত কাজ হয়নি।” মাসীর কথার ঝাঁজে বেণীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে যে এই অভিযোগের কি সাফাই দিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, হঠাৎ রমা ভিতর হইতে তাহার জবাব দিয়া বাসিল; এতক্ষণ সে একটি কথাও কহে নাই। কহিল, “তুমি যখন নিজে বলেছ মাসি, তখন সেই ত সকলের চেয়ে ভাল হয়েছে। যে বতাই বলুক না কেন, এতখানি বিষ মিশ্র দিয়ে ছড়াতে তোমার মত কেউ ত পেরে উঠত না।” মাসী এবং বেণী উভয়েই বার-পর-নাই বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন। মাসী রামাঘরের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “কি বলি না?” “কিছু না। আঙ্গিক কল্পে মনে ত সাতবার উঠলে—বাণে না, ওটা সেরে ফেল না, রামাঘর কি হবে না?” বলিতে বলিতে রমা



নিজেও বাহির হইয়া আসিল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বারান্দা পার হইয়া ওদিকের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেণী শুদ্ধমুখে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, “বাপার কি মাসি?” “কি ক’রে জানব বাছা? ও রাজ-রানীর মেজাজ বোঝা কি আমাদের দাসীবাঁদীর কর্ম?” বলিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে, তিনি মুখখানা কালীবর্ণ করিয়া তাঁহার পুজার আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন, এবং বোধ করি বা মনে মনে ভগবানের নাম করিতেই লাগিলেন। বেণী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

## ২

এই কুঁয়াপুরের বিষয়টা অজ্ঞিত হইবার সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা আবশ্যিক। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে মহাকুলীন বলরাম মুখ্যে, তাঁহার মিতা বলরাম ঘোষালকে সঙ্গে করিয়া, বিক্রমপুর হইতে এদেশে আসেন। মুখ্যে শুধু কুলীন ছিলেন না, বুদ্ধিমানও ছিলেন। বিবাহ করিয়া বর্দ্ধমান রাজ-সরকারে চাকরি করিয়া, এবং আরও কিছু করিয়া, এই বিষয়টুকু হস্তগত করেন। ঘোষালও এই দিকেই বিবাহ করেন। কিন্তু পিতৃকণ শোধ করা ভিন্ন আর তাঁহার কোন কুমতাই ছিল না; তাই, দুঃখে কষ্টেই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। এই বিবাহ উপলক্ষ্যেই নাকি দুই মিতার মনোমালিন্জ ঘটে। পরিশেষে তাহা এমন বিবাদে পরিণত হয় যে, এক গ্রামে বাস করিয়াও বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ কাহারও মুখদর্শন করেন নাই। বলরাম মুখ্যে যে দিন মারা গেলেন, সে দিনেও ঘোষাল তাঁহার বাটতে পা দিলেন না। কিন্তু তাঁহার মরণের পরদিন অতি আশ্চর্য্য কথা ঘটা গেল। তিনি নিজের সমস্ত বিষয় চুল-চিরিয়া অন্ধক ভাগ করিয়া, নিজের পুত্র ও মিতার পুত্রগণকে দিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে এই কুঁয়াপুরের বিষয় মুখ্যে ও ঘোষালবংশ ভোগদখল

করিয়া আসিতেছে। ইহারা নিজেরাও জমিদার বলিয়া অভিমান করিতেন, গ্রামের লোকেও অস্বীকার করিত না। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ঘোষালবংশও ভাগ হইয়াছিল। সেই বংশের ছোট-তরফের তারিণী ঘোষাল মকদমা-উপলক্ষ্যে জেলায় গিয়া দিন ছয়েক পূর্বে ১৮১২ খ্রিঃ দিন, আদালতের ছোটবড় পাঁচসাতটা মুলতুমি মকদমার শেষকালের প্রতি ক্রক্ষেপ না করিয়া, কোণাকার কোন্ অজানা আদালতের মহামাত্র শমন মাথায় করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন, তখন তাঁহাদের কৃষ্ণাপুর গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে একটা হলস্থল পড়িয়া গেল। বড়-তরফের কস্তা বেলী ঘোষাল খুড়ার মৃত্যুতে গোপনে আরামেব নিশাস ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, এবং আরও গোপনে দল পাকাইতে লাগিলেন, কি করিয়া খুড়ার আগামী শ্রাদ্ধের দিনটা পণ্ড করিয়া দিবেন। দশ বৎসর পুড়া-ভাইণায় মূণ দেপাদেখি ছিল না। বহু বৎসর পূর্বে তারিণীর গৃহ শূণ্য হইয়াছিল। সেই অবধি পুত্র রমেশকে তাহার মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তারিণী বাটীর ভিতরে দাসদাসী, এবং বাহিরে মকদমা কইরাট কাল কাটাইতেছিলেন। রমেশ রুড়কি-কলোজে এই ভ্রমসংবাদ পাইয়া পিতার শেষ-কর্তব্য সম্পন্ন করিতে সুদীর্ঘকাল পরে কাল' অপরাহ্নে তাহাব শূন্যগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্ম্বাড়া। মধ্যে শুধু দুটো দিন বাকী। বৃহস্পতিবারে রমেশেব পিতৃশ্রাদ্ধ। দুই একজন করিয়া ভিন্ন গ্রামের মুকবিরা উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু নিজেদের কৃষ্ণাপুরের কেন যে কেহ আসে না, রমেশ তাহা বুঝিয়াছিল,—হয় ত, শেষ পর্য্যন্ত কেহ আসিবেই না, তাহাও জানিত। শুধু ভৈরব আচার্য্য ও তাহার বাড়ীর লোকেরা আসিয়া কাজকর্ম্মে যোগ দিয়াছিল। স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের পদধুলির আশা না থাকিলেও, উদ্যোগ-আয়োজন গ্রামের বড়লোকের মতই করিতেছিল। আজ অনেককাল পর্য্যন্ত

রমেশ বাড়ীর ভিতরে কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল। কি জন্তে বাহিরে আসিতেই দেখিল, ইতিমধ্যে জন-দুই প্রাচীন ভদ্রলোক আসিয়া, বৈঠকখানার বিছানায় সমাগত হইয়া ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে কিছু বলিবার পূর্বেই, পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, এক অতি বৃদ্ধ ৫৬টি ছেলেমেয়ে লইয়া কাসিতে কাসিতে বাড়ী ঢুকিলেন। তাহার কাঁধের উপর মলিন উত্তরীয়, নাকের উপর একষোড়া ভাঁটার মত মস্ত চস্মা,—পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা শাদা চুল, শাদা গোক—তামাকের ধূঁয়ার তাত্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া আসিয়া তিনি সেই ভীষণ চস্মার ভিতর দিয়া রমেশের মুখের দিকে মুহূর্তকাল চাখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেশ চিনিলা না, ইনি কে, কিন্তু যেই হোন, ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিতেই, তিনি ভাঙা-গলায় বলিয়া উঠিলেন, —“না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন ক’রে কাঁকি দিয়ে পালাবে, তা স্বপ্নেও জানিনে, কিন্তু আমারও এমন চাটুঘো-বংশে জন্ম নয় যে, কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরুবে। আসবার সময় তোমার বেণী বোবালের মুখের সামনে ব’লে এলুম, আমাদের রমেশ যেমন প্রাচীর আরোজন কর্চে, এমন করা চুলোয় থাক, এ অঞ্চলে কেউ চোখেও দেখেনি।” একটু থামিয়া বলিলেন, “আমার নামে অনেক শালা অনেক রকম ক’রে তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা’ কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, এই ধর্মদাস শুধু ধর্মেরই দাস, আর কারো নয়।” এই বলিয়া বৃদ্ধ সত্য-ভাষণের সমস্ত পৌরুষ আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাত হইতে হাঁকটা ছিনিয়া লইয়া তাহাতে এক টান দিয়াই প্রবলবেগে কাসিয়া ফেলিলেন।

ধর্মদাস নিভান্ত অত্যাক্তি করে নাই। উত্তোগ-আয়োজন প্রকাশ হইতেছিল, এদিকে সেরূপ কেহ করে নাই। কলিকাতা হইতে ময়রা আসিয়াছিল, তাহার প্রাচীরের একধারে তিরান

চড়াইরাছিল। সেদিকে পাড়ার কতকগুলো ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইরাছিল। কাকালীদের বস্ত্র দেওয়া হইবে। চণ্ডী-মণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় অমুগত ভৈরব আচার্য্য খান ফাড়িয়া পাট করিয়া, প্রাদা করিতেছিল—সে দিকেও জনকল্পে লোক থাৰা পাতিয়া বসিয়া এই অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া, মনে মনে রমেশের নিৰ্কুৎস্থিতার জন্ত তাহাকে গালি পাড়িতেছিল। গরীব-দুঃখী সংবাদ পাইয়া অনেক দূরের পথ হইতেও আসিয়া জুটিতেছিল। লোকজন, প্রজাপাঠক বাড়ী পরিপূর্ণ করিয়া, কেহ কলহ করিতেছিল, কেহ বা মিছামিছ শুধু কোলাহল করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া, ধৰ্ম্মদাসের কাসি আরও বাড়িয়া গেল।

প্রত্যন্তরে রমেশ সঙ্কুচিত হইয়া ‘না না’ বলিয়া আরও কি বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু ধৰ্ম্মদাস হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিয়া ষড় ষড় করিয়া কত কি বলিয়া ফেলিলেন; কিন্তু কাসির ধমকে তাহার একটি বর্ণও বোঝা গেল না।

গোবিন্দ গাজুলী সৰ্ব্বাঙ্গে আসিয়াছিলেন। সুতরাং ধৰ্ম্মদাস যাহা বলিয়াছিল, তাহা বলিবার সুবিধা তাঁহারই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকিয়াও নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহার মনে মনে ভারি একটা ক্ষোভ জন্মিতেছিল। তিনি এ সুযোগ আর নষ্ট হইতে দিলেন না। ধৰ্ম্মদাসকে উদ্দেশ্য করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—“কা’ল সকালে, বুল্লে ধৰ্ম্মদাস দা, এখানে আসব ব’লে বেরিয়েও আসা হ’ল না—বেগীর ডাকাডাকি—‘গোবিন্দ খুড়ো, তামাক খেয়ে যাও।’ একবার ভাবলুম, কাজ নেই—তার পর মনে হ’ল, ভাবখানা বেগীর দেখেই বাই না। বেগী কি বল্লে, জান বাবা রমেশ! বলে, খুড়ো, বলি তোমরা ত রমেশের মুকুবিব হয়ে দাঁড়িয়েচ’ কিন্তু দ্বিষ্টেস করি, লোকজন গাৰে-টাৰে ত ?

আমি বা ছাড়ি কেন ? তুমি বড়লোক আছ না আছ, আমার রমেশও কারো চেয়ে খাটো নয়—তোমার ঘরে ত এক মুঠো চিঁড়ের পিত্তোশ কারু নেই।—বললুম, বেণীবাবু এই ত পথ, একবার কাজালী বিদেয়টা দাঁড়িয়ে দেখো।’ কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটা ত বলি একে ! এতটা বয়স হ’ল, এমন আয়োজন কখনও চোখে দেখিনি ! কিন্তু, তাও বলি ধর্মদাস দা, আমাদের সাধাই বা কি ! যার কাজ তিনিই ওপর থেকে করাচ্ছেন। তারিণী-দা শাপভ্রষ্ট দিকপাল ছিলেন বৈ ত নয় !” ধর্মদাসের কিছুতেই কানি খামে না, সে কানিতেই লাগিল, আর তাহার মুখের সামনে গাঙ্গুলী মশাই বেশ বেশ কথাগুলি এই অপরিপক্ব তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতে লাগিলেন দেখিয়া, ধর্মদাস আরও ভাল বলিবার চেষ্টায় যেন আকুলি-বকুলি করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী বলিতে লাগিলেন, “তুমি ত আমার পর নও বাবা, — নিতান্ত আপনার। তোমার মা যে আমার একেবারে সাক্ষাৎ পিসতুত বোনের মামাত ভগিনী। রাধানগরের বাঁড়ুঘো-বাড়ী— সে সব তারিণী দা’ জানতেন। তাই যে কোন কাজকর্মে—মামলা-মকদ্দমা কর্তে, সাক্ষী দিতে—ডাক্ গোবিন্দকে।” ধর্মদাস প্রাণপণবলে কানি খামাইয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন ; “কেন বাজে বকিস্ গোবিন্দ ? থক্—থক্—থক্—আমি আজকের নয়—না জানি কি ? সে বছর সাক্ষী দেবার কথাই বল্লি, ‘আমার জুতো নেই, খালি-পায়ে যাই কি ক’রে ? থক্—থক্—তারিণী অমনি আড়াই-টাকা দিয়ে একজোড়া জুতো কিনে দিলে। তুই সেই পায়ে দিয়ে বেণীর হয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি। থক্—থক্—থক্—থক্—” গোবিন্দ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, “এলুম ?”

“এলিনে ?”

“হুঁ মিথ্যাবাদী !”

“মিথ্যাবাদী জোর কাম্বা !”

গোবিন্দ তাহার ভাঙা-ছাতি হাতে করিয়া লাফাইয়া উঠিল—  
“তবে রে শালা !”—ধর্মদাস তাহার বাঁশের লাঠি উচাইয়া ধরিয়া  
হুকুম দিয়াই প্রচণ্ডভাবে কাসিয়া ফেলিল। রমেশ শশব্যস্তে  
উভয়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধর্মদাস  
লাঠি নামাইয়া কাসিতে কাসিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, “ও-শালার  
সম্পর্কে আমি বড়-ভাই হই কি না, তাই শালার আকুল দেখে—”

“ওঃ, শালা আমার বড় ভাই !” বলিয়া গোবিন্দ গান্ধুলীও  
ছাতি গুটাইয়া বসিয়া পড়িল।

সহরের ময়রার ভিড়ান ছাড়িয়া চাহিয়া রহিল। চতুর্দিকে  
যাহারা কাজকর্ম নিযুক্ত ছিল, চেঁচামিচি শুনিয়া তাহার তামাসা  
দেখিবার জন্য সম্মুখে ছুটিয়া আসিল; ছেলেদেরা খেলা  
ফেলিয়া ইঁা করিয়া মজা দেখিতে লাগিল; এবং এই সমস্ত  
লোকের দৃষ্টির সম্মুখে রমেশ লজ্জার, বিষ্ময়ে, হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ  
হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির  
হইল না। কি এ ? উভয়েই প্রাচীন, ভদ্রলোক—ব্রাহ্মণ-সন্তান !  
এত সামান্য কারণে এমন ইতরের মত গালিগালাজ করিতে পারে ?  
বারান্দার বসিয়া ভৈরব কাপড়ের খাক দিতে দিতে সমস্তই দেখিতে  
ছিল, শুনিতেছিল। এখন উঠিয়া রমেশকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল,  
“প্রায় শ’-চারেক কাপড় ত হ’ল, আরও চাই কি ?” রমেশের  
মুখ দিয়া হঠাৎ কথাই বাহির হইল না। ভৈরব রমেশের অভ-  
ভূতভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিল। মৃত অনুরোধের স্বরে কহিল, “ছিঃ  
গান্ধুলী মশাই ! বাবু একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আপনি  
কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয়। বৃহৎ কাজকর্মের  
বাড়ীতে কত ঠেঙা-ঠেঙি, রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হ’য়ে যায়—আবার  
ধেঁকে সেই হয়। নিন্ উঠুন, চাটুঘো মশাই,—দেখুন দেখি,  
আরও খান কাড়ুক কি না ?” ধর্মদাস জবাব দিবার পূর্বেই গোবিন্দ

পাখুলী সোৎসাহে শিরশ্চলনপূর্বক খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন, “হরই ত! হরই ত! চের হর! নইলে বিরল কর্তৃক বলেচে কেন? শান্তরে আছে, লক কথা না হলে বিয়েই হয় না বে! সে বছর তোমার মনে আছে ভৈরব, বহু মুখ্যো মশায়ের কস্তা রমার গাছ পিণ্ডিষ্ঠের দিনে সিধে নিয়ে রাখব ভট্টাচার্য্যে, হারাণ চাটুঘ্যেতে মাথা-কাটাকাটি হ’রে গেল! কিন্তু আমি বলি ভৈরব ভায়া, বাবাজীর এ কাজটা ভাল হচ্ছে না। ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া, আর ভস্মে বিচালা এক কথা। তার চেয়ে বায়ুনদের একগোড়া, আর ছেলেদের একখানা ক’রে দিলেই নাম হ’ত। আমি বলি বাবাজী সেই যুক্তিই করুন, কি বল ধর্মদাস-দা?” ধর্মদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, “গোবিন্দ মন কথা বলেনি, বাবাজী। ও বাটাদের হাজার মিলেও নাম হবার জো নেই। নইলে আর ওদের ছোটলোক বলেছে কেন? বুঝলে না বাবা রমেশ?” এখন পর্য্যন্ত রমেশ নিঃশব্দে ছিল। এই বয়-বিতরণের আলোচনার সে একেবারে যেন মগ্নাভূত হইয়া পড়িল। ইহার স্মৃতি-কুস্মৃতি সম্বন্ধে নহে; এখন এইটাই জাহার সর্কা-পেক্ষা অধিক বাঞ্ছিত যে, ইহার বাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া ডাকে, তাহাদেরই সহস্র চক্ষুর সম্মুখে এইমাত্র যে এত বড় একটা লজ্জাকর কাণ্ড কবিয়া বসিল, সে লজ্জা ইহাদের কাহারও মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জার কণামাত্রও নাই। ভৈরব মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া, রমেশ সংক্ষেপে কহিল, “আরও দু’শ কাপড় ঠিক ক’রে রাখুন।” “তা নইলে কি হয়? ভৈরব ভায়া, চল, আমিও বাই—তুমি একা আর কত পারবে বল?” বলিয়া কাহারও সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া গোবিন্দ উঠিয়া বস্ত্ররাশির নিকট গিয়া বসিল। রমেশ বাটার ভিতরে বাইবার উপক্রম করিতেই ধর্মদাস তাহাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি অনেক কথা কহিল। রমেশ প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া সম্মতি-জ্ঞাপন

করিয়া ভিক্টরে চলিয়া গেল। কাপড় শুছাইতে শুছাইতে গোবিন্দ  
 বাবুদী আড়চোখে সমস্ত দেখিল। “টেক গো, বাবাজী কেঁথার  
 গো?” বলিয়া একটি নীর্ণকার মুণ্ডিতশ্রদ্ধা প্রাচীন ব্রাহ্মণ প্রবেশ  
 করিলেন। ইহার সঙ্গেও গুটিতিনেক ছেলে-মেয়ে। মেয়েটি  
 সকলের বড়। তাহারই পরণে শুধু একখানি অতি জীর্ণ ডুৱে-  
 কাপড়। বালক দু’টি কোমরে এক-একগাছি ঘুনসি ব্যতীত  
 একেবারে দিগম্বর। উপস্থিত সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। গোবিন্দ  
 অন্তর্ধান করিল—“এস দীহুদা, বোসো। বড় ভাগ্যি আমাদের  
 যে, আজ তোমার পারের ধুলো পড়ল। ছেলেটা একা সারা  
 হয়ে যায়, তা’ তোমরা—” ধর্মদাস গোবিন্দের প্রতি কটুমটু করিয়া  
 চাহিল। সে ক্রম্বেপমাত্র না করিয়া কহিল, “তা তোমরা ত কেউ  
 এ দিক্ মাড়াবে না, দাদা,”—বলিয়া তাহার হাতে হ’লুটা তুলিয়া  
 দিল। দীহু ভুটচাষ আসন গ্রহণ করিয়া দক্ষ-হ’কাটার নিরর্থক  
 গোটা দুই টান দিয়া বলিলেন, “আমি তু ছিলাম না ভায়া—তোমার  
 বোঁঠাকরণকে আনতে তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম। বাবাজী  
 কোথায়? শুন্চি নাকি ভারি আয়োজন হচ্ছে? পথে আসতে  
 গু-গাঁয়ের হাটে শুনে এলুম, খাইয়ে দাইয়ে ছেলে বড়োর হাতে  
 ষোলখানা ক’রে লুচি আর চার-জোড়া ক’রে সন্দেশ দেওয়া হবে।”  
 গোবিন্দ গলা খাটো করিয়া কহিল, “তা ছাড়া হয় ত একখানা  
 ক’রে কাপড়ও। এই যে রমেশ বাবাজী, তাই দীহুদা’কে বল্ছিলুম  
 বাবাজী—তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে যোগাড়-  
 সোগাড় একরকম করা ত যাচ্ছে, কিন্তু বেণী একেবারে উঠে পড়ে  
 লেগেছে। এই আমার কাছেই দু’বার লোক পাঠিয়েছে। তা আমার  
 কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার যেন নাড়ীর টান  
 রয়েছে; কিন্তু এই যে দীহুদা, ধর্মদাস-দা, এঁরাই কি, বাবা  
 তোমাকে ফেলতে পারবেন? দীহু-দা ত পথ থেকে শুন্তে খেয়ে  
 ছুটে আসছেন। ওরে ও বজীচরণ, তামাক দে না রে। বাবা



রমেশ, একবার এদিকে এস দেখি, একটা কথা বলি।”  
 নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গোবিন্দ কিস্কিন্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,  
 “তেতরে বুঝি ধর্মদাস-গিন্নী এসেছে? খবরদার, খবরদার, অমন  
 কাজটি কোরো না বাবা! বিটলে বাসুন বহুই কোসলাক, ধর্মদাস-  
 গিন্নীর হাতে ভাঁড়ারের চারিটাবি দিয়ো না বাবা, কিছুতে দিয়ো  
 না—বি, ময়দা, তেল, মুন অর্দ্ধেক সূর্য্যে ফেলবে। তোমার ভাবনা  
 কি বাবা? আমি গিয়েই তোমার দামীকে পাঠিয়ে দেব। সে  
 এসে ভাঁড়ারের ভার নেনবে, তোমার একগাছি কুটো পণ্য  
 লোকসান হবে না।” রমেশ খাড়ি নাড়িয়া “খে আজ্ঞে”  
 বলিয়া মোন হইয়া রহিল। তাহার বিন্ধরের অবশি নাই।  
 ধর্মদাস যে তাহার ঘিহীকে ভাঁড়ারের ভার লটবার জন্য পাঠাইয়া  
 দিবার কথা এত গোপনে করিয়াছিল, গোবিন্দ ঠিক তাহাই আশঙ্ক  
 করিল কিরূপে?

উলঙ্গ শিশু-ছোটো ছুটিয়া আসিয়া দীঘ-দা’র কাঁধের উপর ঝুলিয়া  
 পড়িল, “বাবা, সন্দেহ খাব।” দীঘ একবার রমেশের প্রতি, এক-  
 বার গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া কহিল, “সন্দেহ কোথায় পাব রে?”  
 “কেন, ঐ যে হচ্ছে” বলিয়া তাহার ওদিকের ময়রাদেব দেখাইয়া  
 দিল।

“আমরাও দাদা মশাই”—বলিয়া নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে  
 আরও তিন চারিটি ছেলে-মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ধর্মদাসকে  
 ঘিরিয়া ধরিল। “বেশ ত, বেশ ত” বলিয়া, রমেশ ব্যস্ত হইয়া  
 অগ্রসব হইয়া আসিল, “ও আচাৰ্য্য মশাই, বিকেলবেলায় ছেলেরা  
 সব বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, খেয়ে ত আসেনি; ওহে ও কি নাম  
 বুঝায়? নিরে এসো ত ঐ খালটা এদিকে।” ময়রা সন্দেহের  
 কথা লইয়া আসিবামাত্র ছেলেরা উপুড় হইয়া পড়িল; বাটেরা  
 দিবার অবকাশ দেয় না, এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেনের  
 দিয়ারা দেখিতে দেখিতে দীননাথের শুকনট্ট সজল ও তীব্র হইয়া

উঠিল—“ওরে ও খেঁদি, খাচ্চিস্ ত, সন্দেশ হয়েচে কেমন বল দেখি?” “বেশ বাবা।” বলিয়া খেঁদি চিবাইতে লাগিল। দীহু মুহু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “হাঁ, তোদের আবার পছন্দ? মিষ্টি হলেই হ’ল। হাঁ হে কারিকর, এ কড়াটা কেমন নামালে? কি বল, গোবিন্দ ভায়া, এখনো একটু রোদ আছে ব’লে মনে হচ্ছে না?”

ময়রা কোন দিকে না চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ কহিল, “আজ্ঞে, আছে বৈ কি! এখনো ঢের বেলা আছে, এখনো সন্ধ্যা আহিকের—”

“তবে কৈ, দাঁও দেখি একটা গোবিন্দ ভায়াকে চেখে দেখুক, কেমন কল্‌কাতার কারিকর তোমরা! না না, আমাকে আবার কেন? তবে আধখানা—আধখানার বেশী নয়। ওরে ও ষষ্ঠীচরণ, একটু জল আন দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি—” রমেশ ডাকিয়া বলিয়া দিল, “অমনি বাড়ীর ভেতর থেকে গোটা-চারেক থালাও নিয়ে আসিস্ ষষ্ঠীচরণ।” প্রভুর আদেশমত ভিতর হইতে গোটা তিনেক রেকাবি ও জলের গেলাস আসিল এবং দেখিতে দেখিতে এই বৃহৎ থালাও অর্ধেক মিষ্টায় এই তিনটি প্রাচীন ম্যালে রিয়া ক্লিষ্ট, কৃশ, সদ্ব্রাহ্মণের জলযোগে নিঃশেষিত হইয়া গেল। “হাঁ, কল্‌কাতাব কারিকর বটে! কি বল ধর্মদাস-দা?” বলিয়া দীননাথ কঙ্কনিখাস ভ্যাগ করিলেন। ধর্মদাস-দা’র তখনও শেষ হয় নাই, এবং যদিচ তাঁহার অব্যক্ত কণ্ঠস্বর সন্দেশের তাল ভেদ করিয়া সহজে মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিল না, তথাপি বোঝা গেল, এ বিষয়ে তাঁহার মতভেদ নাই। “হাঁ, ওস্তাদি হাত বটে” বলিয়া গোবিন্দ সকলের শেষে হাত ধুইবার উপক্রম করিতেই ময়রা সর্বিনয়ে অমুরোধ করিল, “যদি কষ্টই করলেন, ঠাকুর মশাই, তবে মিহিদানাটাও অমনি পরখ ক’রে দিন।” “মিহিদানা? কৈ, আন দেখি বাপু?” মিহিদানা আসিল এবং এতগুলি সন্দেশের পরে

এই নূতন বস্ত্রটির স্বাব্যবহার দেখিয়া রমেশ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। দীননাথ মেয়ের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, “ওয়ে ও হেঁদি, ধর দিকি মা, এই ছুটো মিহিদানা।” “আমি আর খেতে পারব না বাবা!” “পারবি, পারবি। এক ঢোক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে দিকি, মুখ মেয়ে গেছে বৈ ত নয়! না পারিস, আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ, কা’ল সকালে খান্। হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে! সেন অমৃত! তা’ বেশ হয়েছে। মিষ্টি বুঝি ছ’রকম করলে বাবাজী?” রমেশকে বলিতে হইল না। ময়রা সোৎসাহে কহিল, “আজ্ঞে না, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন—”

আঁা, ক্ষীরমোহন? কৈ, সে ত বা’র করলে না বাপু?” বিস্মিত রমেশের মুখের পানে চাহিয়া দীননাথ কহিল, “খেয়েছিলুম বটে, রাখানগরের বাসেদের বাড়ীতে। আজও খেন মুখে লেগে রয়েছে। বললে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড় ভালবাসি।” রমেশ হাসিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল। কথটা বিশ্বাস করা তাহার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইল না। রাখাল কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল। রমেশ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “ভেতরে বোধ করি আচাখি মশাই আছেন; যা ত রাখাল, কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আনতে ব’লে আর দেখি।” সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তথাপি ব্রাহ্মণেরা ক্ষীরমোহনের আশায় উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ফিরিয়া আখিয়া বলিল, “আজ্ঞ আর ভাঁড়ারের চাবি খোলা হবে না বাবু!” রমেশ মনে মনে বিরক্ত হইল। কহিল, “বল্ গে, আমি আনতে বলছি।”

গোবিন্দ গান্ধূলী রমেশের অসন্তোষলক্ষ্য করিয়া ঢোক ঘূসাইয়া কহিল, “দেখলে দীহু দা ভৈরবের আক্কেল? এ বে দেখি, মাগের চেয়ে মাসীর বেশী দরদ। সেইজন্যই, আমি বলি—” তিনি কিছু বলেন, তাহা না শুনিয়াই রাখাল বলিয়া উঠিল—“আচাখি মশাই কি করবেন? ও বাড়ী থেকে গিন্নীমা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করেছেন যে।”

ধর্মদান এবং গোবিন্দ উভয়ে চমকিয়া উঠিল—“কে, বড়-গিন্নী ?” রমেশ সন্নিহনে জিজ্ঞাসা করিল, “জ্যাঠাইমা এসেছেন ?” “আজ্ঞে হাঁ, তিনি এসেই ছোট বড় ছই ভাঁড়ারই তালাবন্ধ করে ফেলেচেন।” বিস্ময়ে, আনন্দে, রমেশ দ্বিতীয় কথাটিনা বলিয়া ক্রতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

৩

“জ্যাঠাইমা ?” ডাক শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী ভাঁড়ারঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বৌদি বয়সেব সঙ্গে তুলনা করিলে তাহার জননীর বয়স প্রকাশের কম হওয়া উচিত নয়; কিন্তু দেখিলে কিছুতেই চল্লিশের বেশী বলিয়া মনে হয় না। রমেশ নিনিমেষ-চক্ষে চাহিয়া বহিল। আজও সেই কাচাসোনার বর্ণ। একদিন যে রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজও সেই অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য তাহার নিটোল, পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জন করিয়া দূরে বাইতে পাবে নাই। মাথায় চুনগুণি ছোট করিয়া ছাঁটা, স্নগ্ধের ছই একগাছি কুণ্ডিত হইয়া কপালের উপর পাড়িয়াছে। চিবুক, কপোল, ওষ্ঠাধর, ললাট, নবজলি যেন কোন বড় শিল্পীর বহুযত্নের, বহুসাধনার ফল। সব চেয়ে আশ্চর্য্য তাহার দুটি চক্ষুর দৃষ্টি। সেদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে সমস্ত অন্তঃকরণ যেন মোতাবিষ্ট হইয়া আসিতে থাকে।

এই জ্যাঠাইমা রমেশকে এবং বিশেষ করিয়া তাহার পরলোকগতা জননীকে একসময় বড় ভালবাসিতেন। বধু-বয়সে যখন ছেলেরা হয় নাই—শাকডী-নন্দের যত্নেয় লুকাইয়া বসিয়া এই দুটি জায়ে যখন একযোগে চোখের জল ফেলিতেন—তখন এই স্নেহের প্রথম-প্রস্থি-বন্ধন হয়। তার পরে, গৃহ-বিচ্ছেদ, মামলা-মকদ্দমা, পৃথক-হওয়া, কত রকমের ঝড়ঝাপটা এই দুটি সংসারের উপর মিমা বহিয়া গিয়াছে; বিবাদের উদ্ভাপে বাধন শিথিল হইয়াছে; কিন্তু, একে-বারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। বহুবর্ষ পরে সেই ছোট বোয়ের

ভাঁড়ারঘরে ঢুকিয়া, তাহারি হাতের সাজানে। সেই সমস্ত বহু পুরা-  
তন হাঁড়ি-কলসির পানে চাহিয়া, জ্যাঠাইমার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া  
পড়িতেছিল। রমেশের আস্থানে যখন তিনি চোখ মুছিয়া বাহির  
হইয়া আসিলেন, তখন সেই দুটি আরক্ত আঁঠু চক্ষু-পল্লবের পানে  
চাহিয়া রমেশ ক্রণকালের জন্য বিশ্বয়াপন্ন হইয়া রহিল। জ্যাঠাইমা  
তাঁহা টের পাইলেন। তাহাতেই, বোধ করি, এই সম্ভ-পিতৃহীন  
রমেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা যেভাবে  
হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহার লেশমাত্র তিনি বাহিরে প্রকাশ  
পাইতে দিলেন না। বরং একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, “চিন্তে  
পারিস্, রমেশ ?” জবাব দিতে গিয়া রমেশের ঠোঁট কাঁপিয়া গেল।  
মা মারা গেলে, যতদিন না সে মামার বাড়ী গিয়াছিল, ততদিন, এই  
জ্যাঠাইমা তাহাকে বুকে করিয়া বাঁধিয়াছিলেন এবং কিছুতে ছাড়িতে  
চাহেন নাই। সেও মনে পড়িল; এবং এও মনে হইল, সেদিন  
ওবাড়ীতে গেলে জ্যাঠাইমা বাড়ী নাই বলিয়া দেখা পর্য্যন্ত করেন  
নাই। তার পর, রমাদের বাটীতে বেণীর সাক্ষাতে এবং  
অসাক্ষাতে তাহার মাসীর নিরতিশয় কঠিন তিরস্কারে সে নিশ্চয়  
বুঝিয়া আসিয়াছিল, এ গ্রামে আপনার বলিতে তাহার আর  
কেহ নাই। বিখ্যেখরী রমেশের মুখের প্রতি মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া  
থাকিয়া বলিলেন, “ছি, বাবা, এ সময়ে শক্ত হ’তে হয়।” তাঁহার  
কণ্ঠস্থরে কোমলতার আভাসমাত্র যেন ছিল না। রমেশ নিজে  
সামলাইয়া ফেলিল। সে বুঝল, যেখানে অভিমানের কোন  
মর্যাদা নাই, সেখানে অভিমান প্রকাশ পাওয়ার মত বিড়ম্বনা  
সংসারে অল্পই আছে। কহিল, “শক্ত আমি হইয়াছি, জ্যাঠাইমা।  
তাই বা পারতুম, নিজেই করতুম; কেন তুমি আমার এলে ?”  
জ্যাঠাইমা হাসিলেন। কহিলেন, “তুই ত আমাকে ডেকে  
আনিস্নি, রমেশ, যে, ডেকে তার কৈফিয়ৎ দেব ? তা শোন  
বলি। কাজকর্ম হবার আগে আর আমি ভাঁড়ার খেঁকে

খাবার-টাবার কোনো জিনিস বার হ'তে দেব না। খাবার সময় ভাঁড়ারের চাবি তোর হাতেই দিয়ে বাব, আবার কা'ল এসে তোর হাত থেকেই নেব। আর কার হাতে দিস্নি বেন! হাঁ রে, সে দিন তোর বড়দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?" প্রশ্ন শুনিয়া রমেশ দ্বিধায় পড়িল। সে ঠিক বৃত্তিতে পারিল না, তিনি পুত্রের ব্যবহার জানেন কি না। একটু ভাবিয়া কহিল, "বড়দা তখন ত বাড়ী ছিলেন না।" প্রশ্ন করিয়াই জ্যাঠাইমার মুখের উপর একটা উদ্বেগের ছায়া আনিয়া পড়িয়াছিল; রমেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার এই কথায় সেই ভাবটা যেন কাটিয়া গিয়া মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হাসিমুখে, স্নেহে অল্পবোধের কণ্ঠে বলিলেন, "আ! আমার কপাল! এই বৃত্তি? হাঁ রে, দেখা হয়নি ব'লে আর যেতে নেই? আমি জানি রে, সে তোদের ওপর সন্তুষ্ট নয়; কিন্তু, তোর কাজ ত তোকে করা চাই! বা, একবার ভাল ক'রে বলগে বা, রমেশ! সে বড় ভাই, তার কাছে হেঁট হতে তোর কোন লজ্জা নেই। তা' ছাড়া এটা মানুষের এগুনি দুঃসময় বাবা, যে, কোন লোকের হাতে পায়ে ধরে মিটুমাট ক'রে নিতেও লজ্জা নেই। লক্ষ্মী মাণিক আমার, বা একবাব—এখন বোধ হয়, সে বাড়ীতেই আছে।" রমেশ চুপ করিয়া রহিল। এই আগ্রহাতিশয্যের হেতুও তাহার কাছে স্পষ্ট হইল না, ঘন হইতে সংশয়ও ঘুচিল না। বিবেচনারী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "বাইরে ধারা ব'সে আছেন, তাঁদের আমি তোর চেয়ে জানি। তাঁদের কথা শুনিস্নে। আর আমার সঙ্গে তোর বড়দাদার কাছে একবার যাবি চল।" রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না জ্যাঠাইমা, সে হবে না। আর বাইরে ধারা ব'সে আছেন, তাঁরা যাই হোন, তাঁরাই আমার সকলের চেয়ে আপনায়।" সে আরও কি কি বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ জ্যাঠাইমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে মহাবিস্ময়ে চুপ করিল। তাহার

মনে হইল, জ্যাঠাইয়ার মুখখানি যেন সহসা চারিদিকের সন্ধ্যার চেয়েও বেশি মলিন হইয়া গিয়াছে। ধানিক পরেই তিনি একটা নিশাস ফেলিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তবে তাই। এখন তার কাছে যাওয়া হতেই পারবে না, এখন আর সে নিয়ে কথা করে কি হবে। যা হোক, তুই কিছু ভাবিসনে বাবা, কিছুই আটকানো না। আমি আবার খুব ভোরেই আসব।” বলিয়া বিশেষরূপে তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া লইয়া থিড়কির দ্বার দিয়া ধীবে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। বেণীর সহিত রমেশের ইতিমধ্যে দেখা হইয়া যে একটা কিছু হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিলেন। তিনি যে পথে চলিয়া গেলেন, সেই দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, রমেশ স্নানমুখে এখন বাহিরে আসিল, তখন গোবিন্দ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবাজী বড় গিন্নী এসেছিলেন না?” রমেশ বাড়ি নাড়িয়া বলিল, “হাঁ।” “কুনলুম, ভাঁড়ার বন্ধ ক’রে চাবি নিয়ে গেলেন না।” রমেশ তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল। কারণ, অবশেষে কি মনে করিয়া তিনি বাইবার সময় ভাঁড়ারের চাবি নিজেই লইয়া গিয়াছিলেন। “দেখলে ঈশ্বরদাস-দা, যা বলেছি তাই। বলি, মংলবটা বুঝলে বাবাজী?” রমেশ মনে মনে অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু নিজের নিরুপায় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র দীহু ভট্টাচার্য তখনও ঘর নাই। কারণ, তাহার বুদ্ধি-গুদ্ধি ছিল না। সে ছেলে-মেয়ে লইয়া বাহার দয়ালু পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইতে পাইয়াছিল, তাহাকে আন্তরিক ছুটো আশীর্বাদ না করিয়া, সকলের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে তাহার সাতপুরুষের স্তব-স্ততি না করিয়া আর ঘরে ফিরিতে পারিতেছিল না। সে ব্রাহ্মণ নিরীহভাবে বলিয়া ফেলিল, “এ মংলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া? তালাবন্ধ ক’রে চাবি নিয়ে গেছেন, তার মানে ভাঁড়ার আর ঘরো হাতে না পড়ে। তিনি সমস্তই তা জানেন।” গোবিন্দবাবু হইয়াছিল; নিঃশব্দে

কথা শুনিয়া উঠিয়া তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল, “বোঝো না, সোঝো না, তুমি কথা কও কেন বল ত। তুমি এ সব ব্যাপারের কি বোঝ, যে মানে করতে এসেচ ?” ধমক খাইয়া দীক্ষুর নির্বুদ্ধিতা আরও বাড়িয়া গেল। সেও উচ্চ হইয়া জবাব দিল, “আরে, এতে বোঝাবুঝিটা আছে কোন্‌খানে ? শুন্‌চ না, গিন্নী-মা স্বয়ং এসে বন্ধ ক’রে চাবি নিয়ে গেছেন ? এতে কথা কইবে আবার কে ?” গোবিন্দ আগুন হইয়া কহিল, “ঘরে যাও না ভট্টাচার্য। যে জন্তু ছুটে এসেছিলে—গুটিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধলে, আর কেন, ক্ষীরমোহন পরন্তু খেয়ে, আজ আর হবে না। এখন যাও, আমাদের চের কাজ আছে।” দীক্ষু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রমেশ ততোধিক কুণ্ঠিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। গোবিন্দ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা রমেশের শাস্ত অথচ কঠিন কণ্ঠস্বরে থামিয়া গেল—“আপনার হ’ল কি গাঙুলি মশাই ? থাকে-তাকে এমন থামকা অপমান করতেন কেন ?” গোবিন্দ ভৎসিত হইয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই শুষ্ক-হাসি হাসিয়া বলিল, “অপমান আবার কাকে করলুম বাবাজী ? ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা ক’রে দেখ না, ঠিক সত্যি কথাটি বলেচি কি না। ও ডালে-ডালে বেড়ায় ত আমি পাতায় পাতায় বেড়াই যে ! দেখলে ধর্মদাস-দা, দীনে বামনার আশ্পর্ক ? আচ্ছা—” ধর্মদাস-দা কি দেখিল, তাহা সেই জানে, কিন্তু রমেশ এই লোকটার নিলজ্জতা ও স্পর্ক দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তখন দীক্ষু রমেশের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিল, “না বাবা, গোবিন্দ সত্য কথাই বলেছেন। আমি বড় গরীব, সে কথা সত্যই জানে। ঔদেব মত আমার জমি-জমা চাষবাস কিছুই নেই। এক রকম চেয়েচিন্তে, ভিক্ষেশিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে। ভালজিনিস ছেলেপিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান দেন নি—তাই, বড় ঘরে কাজকর্ম হ’লে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিছু মনে



কোরো না, বাবা, তারিণী দাদা বেঁচে থাকতে তিনি আমাদের খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। তাই, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি বাবা, আমরা যে আশ মিটিয়ে খেয়ে গেলুম, তিনি ওপর থেকে, দেখে খুসীই হয়েছেন।” হঠাৎ দীর্ঘর গভীর, শুক চোখদুটো জলে ভরিয়া উঠিয়া, টপ্‌টপ্‌ করিয়া দুফোঁটা সকলের সমুখেই করিয়া পড়িল। রমেশ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘ তাহার মলিন ও শতচ্ছিন্ন উত্তরীয়প্রান্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, “শুধু আমিই নই বাবা! এদিকে আমার মত ছুখী-গরীব যে যেখানে আছে, তারিণীদার কাছে, হাত পেতে কেউ কখনো অমনি ফেরেনি। সে কথা কে আর জানে বল? তাঁর ডান হাতের দান বাঁ হাতটাও টের পেত না যে। আর তোমাদের জ্বালাতন করব না। নে. মা, খেঁদি ওঠ, হরিধন, চল বাবা ঘরে যাই, আবার কাল সকালে আসব। আর কি বলব, বাবা রমেশ, বাপের মত শুও, দীর্ঘজীবী হও।”

রমেশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পথে আসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, “ভট্টাচার্য্য মশাই, এই ছটো তিনটে দিন আমার ওপর দয়া রাখবেন। আর বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু এ বাড়ীতে হরিধনের মায়ের যদি পায়ের ধুলো পড়ে ত বড় ভাগ্য বলে মনে করব।” ভট্টাচার্য্য মশায় ব্যস্ত হইয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কঁাদ-কঁাদ হইয়া বলিলেন, “আমি বড় ছুখী, বাবা রমেশ, আমাকে এমন করে বললে যে লজ্জার মরে যাই।”

ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রমেশ কিরিয়া আসিয়া মুহূর্তের অল্প নিজের রুঢ় কথা স্বরণ করিয়া গাঙুলী মশায়কে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই, তিনি থামাইয়া দিয়া উদ্যোক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “এ যে আমার নিজের কাজ, রমেশ, তুমি না ডাকলেও যে আমাকে নিজে এসেই সমস্ত করতে হ'ত। তাই ত এসেছি; ধর্ম্মদাস-দাদা আর আমি দুই ভায়ে ত

তোমার ডাক্‌বার অপেক্ষা রাখিনি, বাবা!" ধর্মদাস এইমাত্র তামাক খাইয়া কাসিতেছিল। লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কাসির ধমকে চোখ-মুখ রাঙা করিয়া, হাত ঘুবাইয়া বলিল, "বলি পোন রমেশ, আমরা বেণী ঘোষাল নই। আমাদের জন্মের ঠিক আছে।" তাহার কুৎসিত কথার রমেশ চমকাইয়া উঠিল। কিন্তু আর রাগ করিল না। এই অত্যন্ত সময়ের মধ্যেই সে বুঝিয়াছিল, ইহার শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষে অসঙ্কোচে কত বড় গর্হিত কথা যে উচ্চারণ করে, তাহা জানেও না।

জ্যাঠাইয়ার সম্মেহ অনুরোধ এবং তাঁহার ব্যথিত মুখ মনে করিয়া রমেশ ভিতরে ভিতরে পীড়া অনুভব করিতেছিল। সকলে প্রস্থান করিলে সে বড়দার কাছে বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি আটটা। ভিতরে যেন একটা লড়াই চলিতেছে। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাঁকা-হাঁকিটাই সব চেয়ে বেশী। বাহির হইতেই তাহার কানে গেল, গোবিন্দ বাজি রাখিয়া বলিতেছে, "এ যদি না দু'দিনে উচ্ছন্ন যায়, ত আবার গোবিন্দ গাঙ্গুলী নাম তোমরা বদলে রেখো, বেণী বাবু! নবাবি কাণ্ডকারখানা শুনলে ত? তারিণী ঘোষাল সিকি পয়সা রেখে মরেনি, তা' জানি, তবে এত কেন? হাতে থাকে কর, না থাকে, বিষয় বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা ক'রে বাপের ছাদ করে, তা ত কখনো শুনিনি, বাবা! আসি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, বেণীমাধব বাবু, এ ছোঁড়া নন্দীদের পদ থেকে অস্ত্রত: তিনটি হাজার টাকা দেনা ক'রেচে।" বেণী উৎসাহিত হইয়া কহিল, "তা হ'লে কথাটা ত বার ক'রে নিতে হুচ্ছে, গোবিন্দ খুড়ো?" গোবিন্দ স্বর মৃদু কবিয়া বলিল, "সবুর কর না, বাবাজী! একবার ভাল ক'রে চুকেই দাও না—তার পরে—বাইরে দাঁড়িয়ে কে ও? এ কি, রমেশ বাবাজী? আমরা থাকতে এত রাক্ষসে ছুঁমি কেন, বাবা?" রমেশ সে কথার

জবাব না দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, “বড়দা, আপনার কাছেই এলুম।” বেণী খঁতমুত খাইয়া জবাব দিতে পারিল না। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ কহিল, “আসবে বই কি, বাবা, একশবার আসবে। এ তো তোমারই বাড়ী। আর বড়ভাই গিড়তুল্য। তাই ত আমরা বেণী বাবুকে বলতে এসেছি, বেণী বাবু, তারিণীদার ওপর মনোমালিন্ত তাঁর সঙ্গেই যাক—আর কেন? তোমরা দু’ভাই এক হও, আমরা দেখে চোখ জুড়োই—কি বল, হালদার মানা? ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে, বাবা—কে আছিমে, একখানা কব্বলের আসন-টাসন পেতে দে না রে! না, বেণী বাবু, তুমি বড় ভাই—তুমিই সব। তুমি আলাদা হয়ে থাকলে চলবে না। তা’ ছাড়া বড়গিন্নী ঠাকুরণ যখন স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—” বেণী চম্কাইয়া উঠিল—“মা গিয়ে ছিলেন?”

এই চমকটা লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ মনে মনে খুঁসি হইল। কিন্তু, বাহিরে সে ভাব গোপন করিয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মত খবরটা ফলাও করিয়া বলিতে লাগিল, “শুধু যাওয়া কেন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার—করাকর্ম যা’ কিছু তিনিই ত করতেন। আর তিনি না করলে করবেই বা কে?” সকলেই চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “নাঃ—গাঁয়ের মধ্যে বড়গিন্নী ঠাকুরণের মত মানুষ কি আর আছে?—না হবে? না, বেণীবাবু, সামনে বললে খোসামোদ করা হবে, কিন্তু, যে যাই বলুক, গাঁয়ে যদি লক্ষী থাকেন, ত সে তোমার মা। এমন মা কি কারু হয়?” বলিয়া পুনশ্চ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বেণী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অক্ষুটে কহিল,—“আচ্ছা—” গোবিন্দ চাপিয়া ধরিল, “শুধু আচ্ছা নয়, বেণীবাবু! যেতে হবে, করতে হবে, সমস্ত ভার তোমার উপরে। ভাল কথা, সবাই আপনারা ত উপস্থিত আছেন; নেমন্তন্নটা কি রকম করা হবে; একটা কর্দ ক’রে কেলা হোক না কেন? কি বল, রমেশ বাবাজী?”

ঠিক কথা কি না, হালদার মামা ! ধর্মদাস-দা' চুপ ক'রে রইলে কেন ? কাকে বলতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে, জান ত সব ।”

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ-বিনীত-কণ্ঠে বলিল, “বড়দা, একবার পায়ের ধুলা যদি দিতে পারেন—” বেণী গম্ভীর হইয়া বলিল, “মা যখন গেছেন, তখন আমার যাওয়া না যাওয়া—কি বল, গোবিন্দ খুড়ো ?” গোবিন্দ কথা কহিবার পূর্বেই রমেশ বলিল, “আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাইনে, বড়দা”, যদি অসুবিধে না হয়, একবার দেখে শুনে আসবেন !”

বেণী চুপ করিয়া রহিল । গোবিন্দ কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই রমেশ উঠিয়া চলিয়া গেল । তখন গোবিন্দ বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল, “দেখলে, বেণীবাবু, কথার ভাবখানা ?” বেণী অল্পমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে-ছিল, কথা কহিল না ।

পথে চলিতে চলিতে গোবিন্দের কথাগুলো মনে করিয়া রমেশের সমস্ত মন ঘণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । সে অর্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাতেই আবার বেণী ঘোষালের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল । চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে তখন তর্ক-কোলাহল উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু সে শুনিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না । সোজা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমেশ ডাকিল, “জ্যাঠাইমা !”

জ্যাঠাইমা তাঁহার ঘরের স্রুণ্ধের বারান্দায় অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন ; এত রাতে রমেশের গলা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন । “রমেশ ? কেন রে ?” রমেশ উঠিয়া আসিল । জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “একটু দাঁড়া, বাবা, একটা আলো আনতে ব'লে দি ।” “আলোর কাজ নেই জ্যাঠাইমা, তুমি উঠো না ।” বলিয়া রমেশ অন্ধকারেই একপাশে বসিয়া পড়িল । তখন জ্যাঠাইমা প্রশ্ন করিলেন, “এত রাত্তিরে যে ?”

রমেশ মুহূর্তে কঠে কহিল, “এখনো ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি, জ্যাঠাইমা, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম।” “তবেই মুন্সিঙ্গে ফেল্‌লি, বাবা! এঁরা কি বলেন? গোবিন্দ গাঙ্গুলী, চাটুয্যে মশাই—” রমেশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, “জানিনে, জ্যাঠাইমা, কি এঁরা বলেন। জান্‌তেও চাইনে—তুমি যা' বলবে, তাই হবে।” অকস্মাৎ রমেশের কথার উত্তাপে বিস্ময়গ্ৰস্ত মনে মনে বিস্মিত হইয়া কণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, “কিন্তু তখন যে বল্‌লি রমেশ, এরাই তোরা সব চেয়ে আপনার! তা' যাই হোক, আমার মেয়েমানুষের কথার কি হবে, বাবা?—এ গাঁয়ে যে আবার,—আর এ গাঁয়েই কেন বলি, সব গাঁয়েই—এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না—একটা কাজকর্ম পড়ে গেলে আর মানুষের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায়, এর চেয়ে শক্ত কাজ আর গ্রামের মধ্যে নেই।” রমেশ বিশেষ আশ্চর্য্য হইল না। কারণ, এই কয়দিনের মধ্যেই সে অনেক জানলাত করিয়াছিল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, একরকম জ্যাঠাইমা?” “সে অনেক কথা, বাবা! যদি থাকিস্‌ এখানে, আপনিই সমস্ত জান্‌তে পার্‌বি। কারুর সত্যিকার দোষ-অপরাধ আছে, কারুর মধ্যে অপবাদ আছে—তা' ছাড়া মামলা-মকদ্দমা, মধ্যে সাক্ষী দেওয়া নিয়েও মন্ত দলাদলি। আমি যদি তোরা ওখানে দুদিন আগে যেতুম, রমেশ, তা হ'লে এত উত্তোষ আয়োজন কিছুতে ক'রতে দিতুম না। কি যে সেদিন হবে, তাই কেবল আমি ভাবচি।” বলিয়া জ্যাঠাইমা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাসে যে-কি ছিল, তাহার ঠিক মন্ত্ৰটি রমেশ ধরিতে পারিল না, এবং কাহারো সত্যাকার অপরাধই বা কি এবং কাহারও মিথ্যা অপবাদই বা কি হইতে পারে, তাহাও ঠাহর করিতে পারিল না। বরঞ্চ উদ্বেজিত হইয়া কহিল,—“কিন্তু আমার সঙ্গে ত তার কোন যোগ নেই। আমি একরকম বিদেশী

বল্লেই হয়—কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। তাই আমি বলি, জ্যাঠাইমা, আমি দলানলির কোন বিচারই করব না, সমস্ত ব্রাহ্মণ-শূত্রই নিমন্ত্রণ ক’রে আসব। কিন্তু, তোমার হুকুম ছাড়া ত পারিনে; তুমি হুকুম দাও, জ্যাঠাইমা!” জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিলেন—“এ রকম হুকুম ত দিতে পারিনে রমেশ! তাতে ভারি গোলযোগ ঘটবে। তবে তোর কথাও যে সত্যি নয়, তাও আমি বলিনে। কিন্তু এ ঠিক সত্যি-মিথ্যের কথা নয়, বাবা! সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা ক’রে রেখেচে, তাকে অবরুদ্ধ ক’রে ডেকে আনা যায় না। সমাজ শাই হোক, তাকে মান্য করতেই হলে। নইলে তার ভাল করার মন্দ করার কোন শক্তিই থাকে না—এ রকম হ’লে ত কোন মতেই চলতে পারে না রমেশ।” ভাবিয়া দেখিলে-রমেশ এ কথা যে অস্বীকার করিতে পারিত, তাহা নহে; কিন্তু এইমাত্র নাকি বাহিরে এই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের বড় বড় এবং নীচাশয়তা তাহার বুকের মধ্যে আগুনের শিখার মত জলিতেছিল, তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘৃণাতরে বলিয়া উঠিল, “এ গাঁয়ের সমাজ বলতে ধর্মদাস, গোবিন্দ—এঁরা ত? এমন সমাজের একবিন্দু ক্ষমতাও না থাকে, সেই ত ঢের ভাল, জ্যাঠাইমা!” জ্যাঠাইমা রমেশের উক্তি লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু শাস্তকণ্ঠে বলিলেন, “শুধু এঁরা নয়, রমেশ, তোমার বড়দা’ বেলীও সমাজের একজন কর্তা।” রমেশ চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরপি বলিলেন, “তাই আমি বলি, এঁদের মত নিয়ে কাজ করগে, রমেশ। সবেমাত্র বাড়ীতে পা দিয়েই এঁদের বিরুদ্ধতা করা ভাল নয়।” বিবেচনায় কতটা দূর চিন্তা করিয়া যে এইরূপ উপদেশ দিলেন, তাঁর উদ্ভেজনার সুখে রমেশ তাহা ভাবিয়া দেখিল না; কহিল, “তুমি নিজে এইমাত্র বললে জ্যাঠাইমা, নানান কারণে এখানে দলানলির সৃষ্টি হয়। বোধ করি, ব্যক্তিগত আক্রোশটাই সবচেয়ে বেশী। তা’ ছাড়া, আমি যখন সত্যিমিথে

কারো কোন দোষ অপরাধের কথাই জানিনে, তখন কোন লোককেই বাদ দিয়ে অপমান করা আমার পক্ষে অত্যাচার।" জ্যাঠাইমা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "ওরে পাগলা, আমি যে তোমার গুরুজন—মায়ের মত। আমার কথাটা না শোনাও ত তোমার পক্ষে অত্যাচার।" "কি করব, জ্যাঠাইমা, আমি স্থির করিচি, আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করব।" তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া বিশ্বেষরীর মুখে অশ্রুস্রব হইল; বোধ করি বা মনে মনে বিরক্তও হইলেন; বলিলেন, "তা হ'লে আমার হুকুম নিতে আসাটা তোমার শুধু একটা ছল মাত্র।" জ্যাঠাইমার বিরক্তি রমেশ লক্ষ্য করিল; কিন্তু বিচলিত হইল না। ধানিক পরে আস্তে আস্তে বলিল, "আমি জান্তুম, জ্যাঠাইমা, যা অত্যাচার নয়, আমার সে কাজে তুমি প্রসন্ন-মনে আমাকে আশীর্বাদ করবে। আমার—" তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই বিশ্বেষরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু এটাও ত তোমার জানা উচিত ছিল, রমেশ, যে, আমার সন্তানের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না?"

কথাটা রমেশকে আঘাত করিল। কারণ, মুখে সে যাই বলুক, কেমন করিয়া তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ কা'ল হইতে এই জ্যাঠাইমার কাছে সন্তানের দাবী করিতেছিল, এখন দেখিল, এ দাবীর অনেক উর্দ্ধে তাঁর আপন সন্তানের দাবী আরগা জুড়িয়া বসিয়া আছে। সে ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাপা অভিমানের স্বরে বলিল,—"কা'ল পর্যন্ত তাই জান্তুম, জ্যাঠাইমা! তাই তোমাকে তখন বলেছিলুম, যা' পারি, আমি একলা করি, তুমি এসো না; তোমাকে ডাকবার সাহসও আমার হয়নি।" এই ক্ষুণ্ণ অভিমান জ্যাঠাইমার অগোচর রহিল না। কিন্তু আর জবাব দিলেন না, অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ধানিকপরে রমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বলিলেন, "তবে একটু দাঁড়াও বাছা, তোমার তাঁতের খয়ের চাবিটা এনে দিই" বলিয়া

বরের ভিতর হইতে চাষি আনিয়া রমেশের পারের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চাবিটা ভুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। ঘণ্টাকয়েকমাত্র পূর্বে সে মনে মনে বলিয়াছিল, ‘আর আমার ভয় কি, আমার জ্যাঠাইমা আছেন।’ কিন্তু একটা রাজিও কাটিল না, তাহাকে আবাব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইল, “না, আমার কেউ নেই—জ্যাঠাইমাও আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন।”

৪

বাহিরে এইমাত্র শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। আসন হইতে উঠিয়া রমেশ অভ্যাগতদিগের সাহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—বাড়ীর ভিতরে আহ্বারের সজ্জা পাতা পাড়িবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একটা গোলমাল, হাঁকাহাঁকি শুনিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া, ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিল। ভিতরে রক্ষনশালার কপাটের একপাশে একটি ২৫।২৬ বছরের বিধবা মেয়ে জড়মড় হইয়া, পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং আর একটি প্রোড়া রমণী তাহাকে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে চোখমুখ রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকারে অগ্নিকুলিস বাহির করিতেছে। বিবাদ বাধিয়াছে পরাণ হালদারের সহিত। রমেশকে দেখিবামাত্র প্রোড়া চৈতাইয়া প্রশ্ন করিল, “হাঁ বাবা, তুমিও ও গাঁয়ের একজন জমিদার। বলি, যত দোষ কি এই ক্ষেত্রে বামুনির মেয়ের? মাথার ওপর আমাদের কেউ নেই বলে কি যতবার খুশি শাস্তি দেবে?” গোবিন্দকে দেখাইয়া কহিল, “ঐ উনি মুখুন্ডো বাড়ীর গাছ-পিড়িঠের সময় জরিমানা বলে ইকুলের নামে দশটাকা আমার কাছে আদায় করেননি কি? পারের বোলো-মানা পেতলা-পুজোর জন্তে হুজোড়া পাঠার দাম খসে



নেননি কি? তবে, কতবার ঐ এক কথা নিষে খাটাখাটি করতে চান, শুনি?" রমেশ ব্যাপারটা কি, কিছুই বুঝতে পাবিল না। গোবিন্দ গাঙ্গুলী নসিদ্ধাছন, মীমাংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার বমেশের দিকে, একবার প্রোটোর দিকে চাহিয়া গভীর গলায় কহিল, "যদি আমার নামটাই করলে, কান্ডমাসী, তবে সত্যি কথা বলি, বাচ্চা! খাতিরে কথা কইবার লোক এষ্ট গোবিন্দ পাদুলী নয়, সে দেশ শুদ্ধ লোক জানে। তোমাব মেয়ের পাণ্ড চাও হগ্রেড, সামাজিক জরিমানাও আমরা করেছি—সব মানি। কিন্তু তাকে যজ্ঞিতে কাটি দিতে ত আমরা হুকুমাইনি। মরলে ও ক পোড়াতে আমরা কাঁধ দেব, কিন্তু—" কান্ডমাসী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ম'লে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁবে ক'বে পুড়িয়ে এসো বাচ্চা—আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বাবা, ঠাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কও না? তোমার ছোট ভাজ যে ঐ ভাঁড়ার ঘবে বসে পান সাজছে, সে আর বছর মাসদুইক খবে কোন্ কাঙ্গী বাস করে, এমন হলুদ বোঁটা শব্দেটাই মত হয়ে কিরে এসেছে, শুনি? সে বড়লোকের বড় কথা ব'লি? বেশী খেঁটিয়ে না, বাপু, আমি সব জাবিজুর ভেঙে দিতে পারব। আমরাও ছেলেমেয়ে পেটে ধরেছি, আমরা চিন্তে পার। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।" গোবিন্দ ক্রাপাব মত কাঁপাইয়া পড়িল— "তবে যে, হারামজাদা মাসী—" কিন্তু হারামজাদা মাসী একটুও ভয় পাইল না বরং এক পা আগাইয়া আসিয়া হাতবুখ ঘুরাইয়া কহিল, "মাসুবি না কি রে? ক্ষেত্রিকামনিকে খাটাগে ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে বাবে, তা' বলে মিচি। আমার মেয়ে ত রান্নাঘরে চুকতে বারনি; দোস্ত-গোড়ার আসতে না আসতে হালদার কঁকরপো যে খানকা অপমান করে বসল, বলি তার বেহানের জাতি-অপবাদ ছিল না কি? আমি শু মার আজকের মই গো।

বলি, আরও বল্ব, না এতেই হবে?" রমেশ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভৈরব আচার্য্য ব্যস্ত হইয়া কান্দুর হাতটা প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া সাহুনের কহিল, "এতেই হবে, বাসি, আর কাজ নেই। নে, সুকুমারী, ওঠ মা, চল্ বাছা, আমার সঙ্গে ওষরে গিয়ে বস্ব চল্।" পরাগ হালদার চাদর কাঁধে লইয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, "এই বেশে মাগীদের বাড়ী থেকে একেবারে তাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না, তা' বলে দিচ্ছি। গোবিন্দ! কালীচরণ! তোমাদের মামাকে চাও, ত উঠে এসো বল্চি। বেণী ঘোষাল যে তখন বলেছিল, "মামা, যেরো না ওখানে।" এমন সব থান্কা-নটীর কাণ্ডকারখানা জানলে কি জাভ-জন্ম থোয়াতে এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াই? কালি! উঠে এসো।" মাতুলের পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও কিন্তু কালীচরণ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সে পাটের ব্যবসা করে। বছরচারেক পূর্বে কলিকাতাবাসী তাহার এক গণ্যমান্ত খরিদার বন্ধু তাহার বিধবা ছোটভগিনীটিকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। ঘটনাটি গোপন ছিল না। হঠাৎ খণ্ডরবাটী যাওয়া এবং তথা হইতে তীর্থযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কিছুদিন চাপা ছিল মাত্র। পাছে সেই ছুটিটার ইতিহাস এত লোকের সম্মুখে আবার উঠিয়া পড়ে, এই ভয়ে কালী মুখ তুলিতে পারিল না। কিন্তু গোবিন্দের গায়ের জ্বালা আদৌ কমে নাই। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর গলায় কহিল, "যে বাই বলুক না কেন, এ অঞ্চলের সমাজপতি হলেন বেণী ঘোষাল, পরাগ হালদার, আর বহু মুখুষো মহাশয়ের কন্যা। তাঁদের আমরা ত কেউ ফেলতে পারব না। রমেশ বাবাজী সমাজের অমতে এই ছোটো মাগীকে কেন বাড়ী ঢুকতে দিয়েছেন, তার জবাব না দিলে, কেউ আমরা এখানে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দিতে পারব না।" দেখিতে দেখিতে পাঁচসাত-দশজন চাদর কাঁধে ফেলিয়া একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহার পাড়াগায়েরই

লোক ; সামাজিক ব্যাপারে কোথায় কোন্ চাল সর্বাপেক্ষা লাভজনক, ইহা তাহাদের অবদিত নহে।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-সম্মানেরা যে বাহার খুসি বলিতে লাগিল : ভৈরব এবং দীক্ষু তটুচাষ কাঁদ-কাঁদ হইয়া একবার কাস্তমাসী ও তাহার মেয়ের, একবার গাঙুলী ও হালদার নহাশয়ের হাতে-পায়ে ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল—চারিদিক্ হইতে সমস্ত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্ম্ম ঘেন লগুতগু হইবার সূচনা প্রকাশ করিল। কিন্তু রমেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না ; একে কুখ্যায় কুখ্যায় নিতান্ত কাতর, তাহাতে অকস্মাৎ “এই অভাবনীয় কাণ্ড। সে পাংশুমুখে কেমন ঘেন এক রকম হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

“রমেশ !” অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত লোকের সচকিত দৃষ্টি এক হইয়া বিধেখরীর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তিনি ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া কঁপাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মাথার উপর আঁচল ছিল, কিন্তু মুখখানি অনাবৃত। রমেশ দেখিল, জ্যাঠাইমা আপনিই কখন আসিয়াছেন—তাকে ত্যাগ করেন নাই। বাহিরের লোক দেখিল, ইনিই বিধেখরী, ইনিই ঘোষাল বাড়ীর গিন্নী-মা !

পল্লীগ্রামে সহরের কড়াপর্দা নাই। তজ্জাচ বিধেখরী বড়বাড়ীর বধু বলিয়াই হোক, কিংবা অল্প যে-কোন কারণেই হোক, যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তিসম্বন্ধেও সাধারণতঃ কাহারো সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। সুতরাং, সকলেই বড় বিস্মিত হইল। বাহার শুধু শুনিয়াছিল, কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো চোখে দেখে নাই, তাহার তাঁহার আশ্রয় চোখ দুইটির পানে চাহিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। বোধ করি, তিনি হঠাৎ ক্রোধবশেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলে মুখ তুলিবামাত্রই ভিসি ভৎকণাৎ ধামের পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। সুস্পষ্ট, তীব্র আওয়াজে রমেশের বিহ্বলতা দুচিয়া

গেল। সে সমুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। জ্যাঠাইয়া আড়াল হইতে তেমনি সুস্থপষ্ট, উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “গাঙুলী মশায়কে জ্ঞান দেখাতে মানা ক’রে দে, রমেশ। আর হালদার মশায়কে আমার নাম ক’রে বল যে, আমি সবাইকে আদর ক’রে বাড়ীতে ডেকে এনেচি—সুকুমারীকে অপমান করবার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কাজকর্মের বাড়ীতে হাঁকাহাঁকি, চোঁচাচোঁচি, গালি-গালাজ করতে আমি নিষেধ কর্চি। যার অসুবিধে হবে, তিনি আর কোথায় গিয়ে, বসুন।” বড়গিল্লীর কড়া হুকুম সকলে নিজের কানেই শুনিতে পাইল। রমেশের মুখ তুটিয়া বলিতে হইল না—হইলে সে পারিত না। ইহার ফল কি হইল, তাহা সে দাঁড়াইয়া দেখিতেও পারিল না। জ্যাঠাইমাকে সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায় লইতে দেখিয়া, সে কোনমতে চোখের জল চাপিয়া ক্রতপদে একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল; তৎক্ষণাৎ তাহার হুই চোখ ছাপাইয়া দর-দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আজ সারাদিন সে নিজের কাছে বড় ব্যস্ত ছিল, কে আসিল না আসিল, তাহার খোঁজ সইতে পারে নাই। কিন্তু আর বেই আশুক, জ্যাঠাইয়া যে আসিতে পারেন, ইহা তাহার সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল। যাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িল। শুধু গোবিন্দ-গাঙুলী ও পরাণ হালদার আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে একজন তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ভিড়ের তিতর হইতে অশ্রুটে কহিল, “বসে পড় না খুড়ো! বোলখানা লুচি, চারকোড়া সন্দেশ কে কোথায় থাইয়ে দাইয়ে সঙ্গে দেয়, বাবা।” পরাণ হালদার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য, গোবিন্দ গাঙুলী সত্যই বসিয়া পড়িল। তবে মুখখানা সে বরাবর ভারী করিয়াই রাখিল এবং আহায়ের জন্য পাতা পড়িলে তত্ত্বাবধানের চুকা করিয়া সকলের সঙ্গে পরিক্রিয়াজনে উপবেশন করিল না। বাহাদুর জাহান এই ব্যবহার লক্ষ্য করিল, তাহায়া সকলেই সঙ্গে সঙ্গে হুঁসিল,

গোবিন্দ সহজে কাহাকেও নিকৃতি দিবে না। অতঃপর আর কোন গোলাযোগ ঘটিল না। ব্রাহ্মণেরা বাহা ভোজন করিলেন, তাহা চোখে না দেখিলে প্রত্যয় করা শক্ত; এবং প্রত্যেকেই খুদি, পটল, জাড়া, বুড়ী প্রভৃতি বাটার অল্পপস্থিত বালক-বালিকার নাম করিয়া বাহা বাধিয়া লইলেন, তাহাও যৎকিঞ্চিৎ নহে। সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম প্রায় সারা হইয়া গিয়াছে, রমেশ সদর-দরজার বাহিরে একটা পেন্সারাগাছের তলার অন্তরমনস্কের মত দাঁড়াইয়াছিল, মনটা তাহার তাল ছিল না। দেখিল দীঘল ভট্টাচার্য্য ছেলেদের লইয়া, লুচি মণ্ডার গুরুত্বাবে খুঁকিয়া পড়িয়া, একরূপ অলক্ষ্যে বাহির হইয়া বাইতেছে। সর্বপ্রথমে খেদির নজর পড়ায় সে অপরাধীর মত ধস্ত-মস্ত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া শুককণ্ঠে কহিল, “বাবা, বাবু দাঁড়িয়ে—” সবাই যেন একটু জড়মড় হইয়া পড়িল। ছোট মেয়েটির এই একটি কথা হইতেই রমেশ সমস্ত ইতিহাসটি বৃষ্টিতে পবিল; পলাইবার পথ ঝাকিলে সে নিজেই পলাইত। কিন্তু সে উপায় ছিল না বলিয়া, আগাইয়া আসিয়া সহযোগে কহিল, “খেদি, এ সব, কার জন্তে নিরে যাচ্ছি রে?” তাহাদের ছোট বড় পুঁটুলিগুলির ঠিক সহস্রের খেদি দিতে পারিবে না আশঙ্কা করিয়া দীঘল নিজেই একটুখানি শুকভাবে হাসিয়া বলিলেন, “পাড়ার ছোটলোকদের ছেলে-পিলেরা আছে ত বাবা, এঁটোকাঁটাগুলো নিরে গেলে তাদের হু-খানা চারখানা দিতে পারিব। সে যাই হোক, বাবা, কেন বে দেশ-শুক লোক ওকে গিন্নী-মা ব’লে ডাকে, তা, আল বুঝ্লাম।” রমেশ তাহার কোন উত্তর না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফটকের দার পক্ষস্থ আসিয়া হঠাৎ প্রহর করিল, “আচ্ছা, ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনি ত এদিকের সমস্তই জানেন, এ গাঁয়ে এত রেবারিসি কেন বলতে পারেন?” দীঘল সুখে একটা আঙুরাঙ্গ করিয়া বার দুই খড় নাড়িয়া কহিল, “হারি রে, বাবাজী, আমাদের কুঁরাপুর ত পক্ষে আছে। বে.কান্তি এ ক’ছির যেরে খেদির মামার বাড়ীতে গেছে এলু।” বিশেষ

বামুন-কায়েতের বাস নেই, গাঁয়ের মধ্যে কিন্তু চারটে দল ! হরনাথ বিখ্যেগ, ছুটো বিলিতি আমড়া পেড়েছিল ব'লে তার আপনার ভায়েকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়লে ! সমস্ত গ্রামই, বাবা, এই রকম—ত' ছাড়া মামলায়-মামলায় একেবারে শতচ্ছিন্ন !—খেঁদি, হরিধনের হাতটা একবার বদলে নে, মা ।” রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, “এর কি কোন প্রতীকার নেই, ভট্টাচার্য্য মশাই ?” “প্রতী-কার আর কি ক'বে হবে, বাবা—এ যে ঘোর কলি !” ভট্টাচার্য্য একটা নিখাস ফেলিয়া কহিল, “তবে একটা কথা ব'লতে পারি বাবাজী । আমি তিক্কেসিক্কে ক'রতে অনেক জায়গাতেই ত যাই—অনেকে অমুগ্ধও করেন । আমি বেশ দেখেছি, তোমাদের ছেলে-ছোকরাদের দয়াধর্ম্ম আছে—নেই কেবল বুড়ো ব্যাটারদের । এরা একটু বাগে পেলে আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না ক'রে আর ছেড়ে দেয় না ।” বলিয়া দীহু যেমন ভঙ্গী করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল, তাহাতে রমেশ হাসিয়া ফেলিল । দীহু কিন্তু হাসিতে যোগ দিল না—কহিল, “হাসির কথা নয় বাবাজী, অতি সত্য কথা । আমি নিজেও প্রাচীন হয়েছি—কিন্তু—তুমি যে অন্ধকারে অনেক-দূর এগিয়ে এলে, বাবাজী !” “তা' হোক, ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনি বলুন ।” “কি আর বলব, বাবা, পাড়ার্তা মাত্রই এই রকম । এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী—এ ব্যাটার বাপের কথা মুখে আনলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় । কাস্তবামুনি ত আর মিথ্যে বলেনি—কিন্তু সবাই ওকে ভয় করে ! ভাল করতে, মিথ্যেসাক্ষী, মিথ্যে মোকদ্দমা সাজাতে ওর জুড়ি নেই । বেণীবাবু হাতধরা—কাজেই কেউ একটি কথা কইতে সাহস করে না, বরঞ্চ ওই-ই পাঁচজনের জাত-মেয়ে বেড়াচ্ছে !” রমেশ অনেককণ পর্য্যন্ত আর কোন প্রশ্ন না করিয়া, চুপ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল । রাগে তাহার সর্ব্বদা জ্বালা করিতেছিল । দীহু নিজেই বলিতে লাগিল—“এই আমার কথা তুমি দেখে নিয়ো, বাবা, কেস্তিবামুনি সহজে নিজের পাবে না ।

গোবিন্দ গাঙুলী, পরাণ হালদার, দু-দুটো ভীমকলের চাকে খোঁচা দেওয়া কি সহজ কথা ! কিন্তু যাই বল বাবা, মাগীর সাহস আছে । আর সাহস থাকবে নাই বা কেন ? মুড়ী বেচে খায়, সব ঘরে বাতায়ত করে, সকলের সব কথা টের পায় । ওকে ঘাঁটালে কেলেঙ্কারির সীমা-পরিসীমা থাকবে না, তা ব'লে দিচ্ছি । অন্যায় আর কোন ঘরে নেই বল ? বেণীবাবুকেও—” রমেশ সভয়ে বাধা দিয়া বলিল, “থাক্, বড়দার কথায় আর কাজ নেই”—দীপু অপ্রতিভ হইয়া উঠিল । কহিল “থাক্, বাবা, আমি দুঃখী মানুষ কারো কথায় আমার কাজ নেই । কেউ যদি বেণীবাবুর কানে ভুলে দেয় ত আমার ঘরে আগুন”—রমেশ আবার বাধা দিয়া কহিল, “ভট্টাচার্য্য মশায়, আপনার বাড়ী কি আরো দূরে ?”

“না, বাবা, বেশী দূর নয়, এই বাঁধের পাশেই আমার কুঁড়ে—কোন দিন যদি—” “আস্ব বই কি, নিশ্চয় আস্ব”—বলিয়া রমেশ ফিরিলে উত্তত হইয়া কহিল, “আবার কা'ল সকালেই ত দেখা হবে—কিন্তু তার পরেও মাঝে মাঝে পায়ের ধূলো দেবেন ।” বলিয়া রমেশ ফিরিয়া গেল । “দীর্ঘজীবী হও—বাপের মত হও ।” বলিয়া দীপু ভট্টাচার্য্য অন্তরের ভিতর হইতে আশীর্ষচন বাহির করিয়া ছেলেপুলে লইয়া চলিয়া গেল ।

এ পাড়ায় একমাত্র মধু পালের সুদূর দোকান নদীর পথে হাটের একধারে । দশ বার দিন হইয়া গেল, অথচ সে বাকী দশ টাকা লইয়া যাই নাই বলিয়া, রমেশ কি ঘনে করিয়া নিজেই একদিন সকালবেলা দোকানের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল । মধু পাল মহাসমাদর করিয়া ছোটবাবুকে বারান্দার উপর বোড়া পাতিয়া বসাইল এবং ছোট বাবুর আসিকার হেতু শুনিয়া গভীর আশ্চর্য্যে আবাক হইয়া গেল । যে ধারে, সে উপবাচক হইয়া ঘর বাহিয়া

অংশোধ করিতে আসে, তাহা মধু পাল এতটা বয়সে কখন চোখে ত দেখেই নাই, কানেও শোনে নাই। কথার কথার অনেক কথা হইল। মধু কহিল, “দোকান কেমন ক’রে চলবে, বাবু? হু’ আনা চার আনা একটাকা পাঁচসিকে ক’রে প্রায় পঞ্চাশ বাট টাকা বাকী পড়ে গেছে। এই দিবে যাচি ব’লে হু’ মাসেও আদায় হবার যো’ নেই। এ কি—বাঁড়ুঘো মশাই যে! কবে এলেন? প্রাতঃ-পেল্লাম হই।”

বাঁড়ুঘো মশায়ের বা হাতে একটা গাড়ু, পায়ের নখে, গোড়ালিতে কাদার দাগ, কানে পৈতা জড়ানো, ডানহাতে কচু-পাতায় মোড়া চারিটি কুচোচিংড়ি। তিনি ফৌস করিয়া একটা নিখাস ফেলিয়া বলিলেন, “কা’ল রাত্তিরে এলুম; তামাক খা’ দিকি মধু!” বলিয়া গাড়ু রাখিয়া হাতের চিংড়ি মেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, “সৈকুবি ফেলেনীর আঙ্কেল দেখলি, মধু—খপ্ ক’রে হাতটা আমার ধ’রে ফেল্লে? কালে কালে কি হ’ল বল্ দেখি রে, এই কি এক পদ্মসার চিংড়ি? বাসুনকে ঠকিয়ে ক’কাল খাবি মাগী, উচ্চর যেতে হবে না?” মধু বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া কহিল, “হাত ধরে ফেল্লে আপনার? কুঙ্ক বাঁড়ুঘো মশাই একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—“আড়াইটি পরমা শুধু বাকী, তাই ব’লে খামকা হাটশুদ্ধ লোকের সাম্মে হাত ধরবে আমার? কে না দেখ্লে বল্। মাঠ থেকে বসে এসে, গাড়ুটি মেজে নদীতে হাত-পা ধুয়ে মনে করলুম, হাটটা একবার ঘুরে বাই, মাগী এক চুবড়ি মাছ নিয়ে ব’সে,—আমাকে স্বচ্ছন্দে বল্লে কি না, কিছু নেই ঠাকুর, বা’ ছিল, সব উঠে গেছে! আরে, আমার চোখে ধুলো দিতে পারিল? ডালাটা কস্ ক’রে তুলে ফেলতেই, দেখি না—অমনি কস্ ক’রে হাতটা চেপে ধ’রে ফেল্লে! জোক এই আড়াইটা—আর আজকার একটা—এই সাড়ে তিনটে পরমা নিয়ে আবি গা ছেড়ে পালাব? কি বলিস, মধু?” মধু সার বিষয়



কহিল, “তাও কি হয়!” “তবে, তাই বল না! গাঁয়ে কি শাসন আছে? নইলে মঠে জেলের ধোপা-নাগতে বন্ধ করে, চাল কেটে তুলে দেওয়া যায় না!” হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, “বাবুটি কে মধু?” মধু সগর্বে কহিল, “আমাদের ছোটবাবুকে ছেলে বে! সেদিনের দশ টাকা বাতি ছিল ব’লে নিজে বাড়ী বন্ধে দিতে এসেছেন।” বাঁড়ুঘো মশাই কুচোচিংড়ির অভিযোগ তুলিয়া, ছুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,—“হ্যাঁ, রমেশ বাবাজী? বেঁচে থাক, বাবা—হ্যাঁ, এসে শুনলুম, একটা কাজের মত কাজ করেচ বটে! এমন খাওয়া-দাওয়া এ অঞ্চলে কখনও হয় নি। কিন্তু বড় দুঃখ রইল, চোখে দেখতে পেলুম না! পাঁচ শালার বাগ্নায় প’ড়ে কলকাতার চাকরি করতে গিয়ে হাড়দীর হাল। আরে ছি, সেখানে মাছুষ থাকতে পায়ের!” রমেশ এই লোকটার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু দোকান-শুদ্ধ সকলে তাঁহার কলিকাতা প্রবাসের ইতিহাস শুনিবার জন্য মহাকোতূহলী হইয়া উঠিল। তামাক সাজিয়া মধু-দোকানি বাঁড়ুঘোর হাতে ছ’কাটা তুলিয়া দিয়া, প্রশ্ন করিল, “তার পরে? একটু চাকরি-বাকরি হয়েছিল ত?” “হবে না? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া লেখা আমার?—হ’লে হবে কি,—সেখানে কে থাকতে পারে বল! যেমন ধূরা—তেমনি কাদা। বাইরে বেরিয়ে পাকীঘোড়া চাপা না প’ড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস, ত আনবি, তোর বাপের গুলি!” মধু কখনও কলিকাতার যাব নাই। মেদিনীপুর সहरটা, একবার সাক্ষ্য দিতে গিয়া, দেখিয়া আসিয়াছিল মাত্র। সে ভারি আশ্চর্য হইয়া কহিল, “বলেন কি!” বাঁড়ুঘো ঈষৎ হাসিয়া কহিল—“তোর রমেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা কর না, সত্যি না মিথ্যে। না-মধু, খেতে না পাই, বুকে হাত দিয়ে করে প’ড়ে করে থাকব, সে ভাল, কিন্তু বিদেশ বাবার নামটি কেন কেউ আমার কাছে আর না করে। কললে বিবেক করিয়ে,

সেখানে শুষ্ক-কলমি শাক, চালতা, আমড়া, খোড়-মোচা পর্যন্ত কিনে খেতে হয়! পারবি খেতে? এই একটি মাস না খেয়ে-খেয়ে যেন রোগা ইঁদুরটি হয়ে গেছি! দিবারাত্রি পেট ফুট-ফাট করে, বুকজালা করে, প্রাণ আইটাই করে, পালিয়ে এসে তবে হাঁক-ছেড়ে বাঁচি। না বাবা, নিজের গাঁয়ে ব'নে জোটে একবেলা, এক সন্ধ্যা থাকো; না জোটে, ছেলেমেয়ের হাত ধ'রে ভিক্ষে করব; বাসুনের ছেলের তাত্তে কিছু আর লজ্জার কথা নেই, কিন্তু, মা লক্ষ্মী মাথায় থাকুন—বিদেশ কেউ যেন না যায়!” তাঁহার কাহিনী শুনিয়া সকলে যখন সন্তরে নির্ঝাঁক হইয়া গিয়াছে, তখন বাঁড়ুয্যে উঠিয়া আসিয়া মধুর তেলের তাঁড়ের ভিতর উথড়ি ডুবাইয়া একছটাক তেল বাঁ হাতের তেলোয় লইয়া অর্ধেকটা দুই নাক ও দুই কানের গর্তে চালিয়া দিয়া, বাকীটা মাথায় মাথিয়া ফেলিলেন ও কহিলেন, “বেলা হয়ে গেল, অমনি ডুবটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই! এক পরসার মুণ দে দেখি, মধু, পরসটা বিকেলবেলা দিয়ে যাবো।” “আবার বিকেলবেলা!” বলিয়া মধু অগ্রসরমুখে মুণ দিতে তাহার দোকানে উঠিল। বাঁড়ুয্যে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া, বিস্ময়-বিরক্তির স্বরে কহিয়া উঠিল, “তোরা সব হলি কি, মধু? এ যে গালে চড় মেয়ে পরসা নিস, দেখি?” বলিয়া আগাইয়া আসিয়া নিজেই এক খামচা মুণ তুলিয়া ঠোঙার দিয়া সেটা টানিয়া লইলেন। গাড়া হাতে করিয়া রমেশের প্রতি চাহিয়া মুহূ হাসিয়া বলিলেন,—“ঐ ত একই পথ—চল না বাবাজী, গল্প ক'রতে ক'রতে যাই।” “চলুন”—বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। মধু-দোকানি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া কল্পণ-কণ্ঠে কহিল, “বাঁড়ুয্যে মশাই, সেই মরদার পরসা পাঁচ আনা কি অমনি—”

বাঁড়ুয্যে রাগিয়া উঠিল—“হাঁ রে, মধু, ছবেলা চোখো-চোখি হবে—তোদের কি চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই? পাঁচ বাটা-বেটীর নতলবে কল্কাতার যাওয়া-আসা ক'রতে পাঁচপাঁচটা

টাকা আমার জলে গেল—আর এই তোদের ভাগাদা করবার সময় হ'ল! কারো সর্বনাশ, কারো গোষ মাস—দেখলে বাবা রমেশ, এদের ব্যাভারটা একবার দেখলে?" মধু এতটুকু হইয়া গিয়া অঙ্কুটে বলিতে গেল—“অনেক দিনের—” “হলই বা অনেক দিনের? এমন ক'রে সবাই মিলে পিছনে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না।” বলিয়া বাঁড়ুয্যে একরকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশ ফিরিয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে হাতের হুকটা একপাশে রাখিয়া দিয়া, একবারে পায়েব কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উঠিয়া কহিল, “আমি বনমালী পাড়ুই—আপনাদের ইন্সুলের হেডমাষ্টার। দুদিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি; তাই বলি—” রমেশ সমাদর করিয়া পাড়ুই মহাশয়কে চেয়ারে বসাইতে গেল; কিন্তু, সে সমস্ত্রমে দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল, “আজ্ঞে, আমি যে আপনার ভৃত্য।” লোকটা বরষে প্রাচীন এবং আর-যেই-হোক একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাহার এই অতি বিনীত; কুণ্ঠিত ব্যবহারে রমেশের ননের মাধ্য একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। সে কিছুতেই আসন-গ্রহণে স্বীকৃত হইল না, খাড়া দাঁড়াইয়া নিজের বক্তব্য কহিতে লাগিল। এদিকের মধ্যে এই একটা অতি ছোট রকমের ইন্সুল, মুখ্য্যে ও ঘোষালদের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ৩০।৪০ জন ছাত্র পড়ে। দুই তিন ক্রোশ দূর হইতেও কেহ কেহ আসে। যৎকিঞ্চিৎ গভর্ণমেন্ট-সাহায্যও আছে। তথাপি ইন্সুল আর চলিতে চাহিতেছে না। ছেলেবরষে এই বিদ্যালয়ে রমেশও কিছুদিন পড়িয়া ছিল, তাহার স্মরণ হইল। পাড়ুই মহাশয় জানাইল যে, চাল ছাওয়া না হইলে আগামী বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভিতর আর কেহ বসিতে পারিবে না। কিন্তু সে না হয় পরে চিন্তা করিলে চলিবে; উপস্থিত প্রধান

ছুতাবিনা হইতেছে যে, তিনমাস হইতে শিক্ষকেরা কেহ বাহিনা পায় নাই—সুতরাং, ঘরের খাইয়া বস্ত্রমহিব তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না।

ইকুলের কথায় রমেশ একেবারে সজাগ হইয়া উঠিল। হেড মাস্টার মহাশয়কে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাস্টার-পণ্ডিত চারিজন; এবং তাঁহাদের হাড়-ভাড়া খাটুনির কলে গড়ে দুই জন করিয়া ছাত্র প্রতিবৎসর মাইনার পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। তাহাদের নাম-ধাম বিবরণ পাড়ুই মহাশয় মুখস্থর মত আবৃত্তি করিয়া দিল। ছেলে-দের নিকট হইতে বাহা আদায় হয়। তাহাতে নীচের দু-জন শিক্ষকের কোন মতে, ও গভর্ণমেন্টের সাহায্যে আর একজনের সন্তুপ্তান হয়; শুধু একজনের মাইনাটাই গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে চাঁদা ফুলিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এই চাঁদা সাধিবার জন্যও মাস্টারদের উপরেই—তাঁহারা গত তিন চারি মাস কাল ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক বাড়িতে আট-দশবার করিয়া হাঁটা-হাঁটি করিয়াও মাতটাকা চার আনার বেশী আদায় করিতে পারেন নাই!

কথা শুনিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পাঁচছয়টা গ্রামের মধ্যে এই একটা বিদ্যালয়—এবং এই পাঁচছয়টা গ্রামময় তিন-মাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া বাজ ৭০ আদায় হইয়াছে! রমেশ প্রশ্ন করিল, “আপনার মাইনা কত?” মাস্টার কহিল, “রসিদ দিতে হয় ছাত্রিণী টাকার, পাই তের টাকা পোনর আনা।” কথাটা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাহার মুখপানে চাহিয়া বহিল। মাস্টার তাহা বুঝিয়া কহিল, “আজ্ঞে গভর্ণমেন্টের হুকুম কি না, তাই ছাত্রিণী টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সবই ন্যূনপেক্ষ বাবুকে দেখাতে হয়—নইলে—সরকারী সাহায্য কিছুই পাবে না। সবাই জানে, আপনি কোন ছাত্রকে বিজ্ঞান করলেই আনু-

পারবেন, আমি মিথ্যা বল্চিনে।” রমেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এতে ছাত্রদের কাছে আপনার সম্মান-হানি হয় না?” মাষ্টার লজ্জিত হইল। কহিল, “কি করব, রমেশ বাবু! বেণীবাবু এ কয়টি টাকা দিতেও নাগাজ।”

“তিনিই কণ্ঠা বুঝি?”

মাষ্টার একবার একটুখানি দ্বিধা করিল; কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়। তাই সে ধীরে ধীরে জানাইল যে, “তিনিই সেক্রেটারি বটে; তিনি একটি পরমাণু কখনো খত্ব করেন না। বহু মুখ্যো মহাশয়ের কণ্ঠা—সতীন্দ্রনাথ তিনি— তাঁর দয়া না থাকিলে ইন্সকুল অনেকদিন উঠিয়া যাইত। এ বৎসরই নিজের খরচে চাল ছাইয়া দিবেন, আশা দিয়াও হঠাৎ কেন’ বে সমস্ত সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ কেহই বলিতে পারে না।” রমেশ কোতূহলী হইয়া রমার সম্বন্ধে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া, শেষে জিজ্ঞাসা করিল, “তাঁর একটি ভাই এ ইন্সকুলে পড়ে না?” মাষ্টার কহিল, “যতীন ত? পড়ে বৈকি।” রমেশ বলিল, “আপনার ইন্সকুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে; আজ আপনি যান, কা’ল আমি আপনাদেশ ওখানে বাব।” “যে আজ্ঞে” বলিয়া হেড্‌মাষ্টার আর একবার রমেশকে প্রণাম করিয়া জোর করিয়া তাহার পারের ধূলা মাথায় লইয়া, বিদায় হইল।

### ৬

বিশ্বখরীর সেদিনের কথাটা সেইদিনেই দশখানা গ্রামে পরি-  
চালিত হইয়া গিয়াছিল। বেণী লোকটা নিজে কাহারও মুখের উপর  
ক্ষুণ্ণ কথা বলিতে পারিত না; তাই সে গিন্না রমার মাসীকে ডাকিয়া  
আনিয়াছিল। সেকালে না কি তকক ঝাঁত ফুটাইয়া এক বিরাট  
অবধ আলাইয়া ছাই করিয়া দিয়াছিল। এই বাসীটিও সেদিন  
সকালবেলায় ঘরে ঢড়িয়া যে বিধ উদ্বীর্ণ করিয়া গেলেন, তাহাতে

বিশ্বেশ্বরীর রক্তমাংসের দেহটা, কাঠের নয় বলিয়াই হোক, কিংবা একাগ্র সেকাল নয় বলিয়াই হোক, জলিয়া তন্ময় পুণে পরিণত হইয়া গেল না। সমস্ত অপমান বিশ্বেশ্বরী নীরবে সহ্য করিলেন। কারণ ইহা যে তাহার পুত্রের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা তাহার অগোচর ছিল না। পাছে রাগ করিয়া একটা কথার জবাব দিতে গেলেও এই স্ত্রীলোকটার মুখ দিয়া সর্বাগ্রে তাহার নিজের ছেলের কথাই বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহা রমেশের কর্ণগোচর হয়, এটো নিদারুণ লজ্জার ভয়েই সন্যস্ত সময়টা তিনি কাট হইয়া বসিয়াছিলেন।

তবে, পাড়াগায়ে কিছুই ত চাপা থাকিবার জো নাই। রমেশও শুনিতে পাইল। জ্যাঠাইমার অন্ত তাহার প্রথম হইতেই বরাবর মনের ভিতবে উৎকণ্ঠা ছিল, এবং এই লইয়া মাতা-পুত্রে যে একটা কলহ হইবে, সে আশঙ্কাও করিয়াছিল। কিন্তু বেণী সে বাহিরের লোককে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া নিজের মাকে এমন কবিতা অপমান ও নির্যাতন করিবে, এই কথাটা সহসা তাহার কাছে একটা সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ড বলিয়া মনে হইল, এবং পরমুহূর্তেই তাহার ক্রোধের বহির্গমন ব্রহ্মবজ্র ভেদ করিয়া উঠিল। ভাবিল, ও বাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া যা' মুখে আসে, তাই বলিয়া বেণীকে গালাগালি করিয়া আসে, কারণ, যে লোক মাকে এমন করিয়া অপমান করিতে পারে, তাহাকেও অপমান করা সম্বন্ধে কোমরুপ বাচ-বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাহা হয় না! কারণ, জ্যাঠাইমার অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। সে দিন দীঘল কাছে, এবং কা'ল মাষ্টারের মুখে শুনিয়া রমার প্রতি তাহার ভারি একটা প্রকার ভাব জাগিয়াছিল। চতুর্দিকে পরিপূর্ণ মৃত্যু ও সহস্র প্রকার কদর্য দ্রুততার ভিতরে একা জ্যাঠাইমার জন্মটুকু ছাড়া সমস্ত গ্রামটাই আঁধারে ডুবিয়া পিয়াছে বলিয়া, যখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, তখন এই

মুখ্যোবাতির পানে চাহিয়া একটুখানি আলোর আভাস—তাহা যত তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র হোক—তাহার মনের মধ্যে বড় আনন্দ দিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার এই ঘটনার রম্য বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত মন ঘুরায় ও বিভ্রমায় ভরিয়া গেল। বেণীর সঙ্গে যোগ দিয়া এই দুই মাসী ও বোন্‌ঝিতে মিলিয়া, যে এই অন্ধান করিয়াছে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু, এই দুইটা জীলোকের বিরুদ্ধেই বা সে কি করিবে, এবং বেণীকেই বা কি করিয়া শাস্তি দিবে, তাহাও কোনমতে ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময়ে একটা কাণ্ড বাটিল। মুখ্যো ও ঘোষাগদের কয়েকটা বিষয় এখন পর্য্যন্ত ভাগ হয় নাই। আচার্য্যদের বাটীর পিছনে ‘গড়’ বলিয়া পুষ্করিণীটাও এইরূপ উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি। একসময়ে ইহা বেশ বড়ই ছিল; ক্রমশঃ সংস্কার-অভাবে বুদ্ধিহীন গিয়া এখন সামান্য একটা ডোবার পরিণত হইয়াছিল। ভাল মাছ ইহাতে ছাড়া হইত না, ছিলও না। কৈ, মাগুর প্রভৃতি যে সকল মাছ আপন জনমায়, তাহাই কিছু কিছু ছিল। ভৈরব ইঁপাইতে ইঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে গোমস্তা গোপাল সরকার খাতা লিখিতেছিল, ভৈরব ব্যস্ত হইয়া কহিল, “সরকার মশাই, লোক পাঠাননি? গড় থেকে মাছ ধরানো হচ্ছে যে।” সরকার কলম কাণে গুঁজিয়া মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, “কে ধরছে?” “আবার কে? বেণীবাবুর চাকর দাঁড়িয়ে আছে, মুখ্যোদের খোঁটা দরওয়ানটাও আছে—দেখলুম; নেই কেবল আপনাদের লোক।” “শীগগীর পাঠান।” গোপাল কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; কহিল, “আমাদের বাবু মাছমাংস খান না।” ভৈরব কহিল, “নাই খেলেন; কিন্তু ভাগের ভাগ নেওয়া চাই।” গোপাল বলিল, “আমরা পাঁচজন ত চাই; বাবু বেঁচে থাকলে তিনিও ভাই চাইতেন। কিন্তু, রমেশ বাবু একটু আলাদা ধরনের।” বলিয়া ভৈরবের মুখে বিষয়ের চিহ্ন দেখিয়া সহান্তে

একটুখানি স্নেহ করিয়া কহিল, “এ তো তুচ্ছ দ্রষ্টো নিন্তি মাগুর মাছ, আচাষি মশায়! সেদিন হাটের উত্তরদিকে সেই প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে ওঁরা ছব্বরে ভাগ ক’রে গিলেন, আমাদের কাঠের একটা কুঁচোও দিলেন না। আমি ছুটে এসে বাবুকে জানাতে, তিনি বই থেকে একবার একটু মুখ তুলে হেসে আবার পড়তে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলুম, ‘কি করব বাবু?’ আমার রমেশ বাবু আর মুখটা একবার তোলবারও কুরসৎ পেলেন না। তার পর, পীড়াপীড়ি করতে বইখানা মুড়ে রেখে একটা হাই তুলে বললেন, ‘কাঠ? তা’ আর কি তেঁতুল গাছ নেই?’ শোন কথা! বললুম ‘থাকবে না কেন? কিন্তু ভ্রাতা-অংশ ছেড়ে দেবই বা কেন আর কে কোথায় এমন দেয়?’ রমেশ বাবু বইখানা আবার মেলে ধরে মিনিট পাঁচেক চুপ ক’রে থেকে বললেন, “সে ঠিক। কিন্তু তুখানা তুচ্ছ কাঠের জন্যে ত আর ঝগড়া করা যায় না।” ভৈরব অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল—“বলেন কি।”

গোপাল সরকার মুহু হাসিয়া বারুই মাথা নাড়িয়া কহিল, “বলি ভাল, আচাষি মশাই, বলি ভাল! আমি সেই দিন থেকে বুকেটি আর মিছে কেন। ছোট তরফের মা-মাম্মী, তারিণী ঘোষালের সঙ্গেই অন্তর্ধান হইতেন!” ভৈরব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “কিন্তু, পুরুষটা যে আমার বাড়ীর পিছনেই—আমার একবার জানান চাই।”—গোপাল কহিল, “বেশ ত ঠাকুর, একবার জানিয়েই এসো না। দিব্যাত্মি বই নিয়ে থাকলে, আর সরকারের এত ভয় করলে, কি বিষয়-সম্পত্তি রক্ষে হয়? বহু মুখ্যের কত্তা—দ্বীলোক; সে পর্যন্ত শুনে হেসে কুটিপাটি! সৌমিন্দ গাঙ্গুলিকে ডেকে নাকি সেদিন তামাসা ক’রে বলেছিল, ‘রমেশবাবুকে ধোলো একটা মাসহারা নিয়ে বিষয়টা আমার হাতে দিতে!’ এর চেয়ে লজ্জা আর আছে?’ বলিয়া গোপাল রাগে হুঃখে মুখখানা বিকৃত করিয়া নিজের কাছে বসিল।





বাটীতে জীলোক নাই। সর্বত্রই অব্যবহৃত দ্বার। ভৈরব ভিতরে আসিয়া দেখিল, রমেশ সামনের বারান্দায় একখানা ভাঙা ইঞ্জিচেরার উপর পড়িয়া আছে। রমেশকে তাহার কর্তব্য-কর্মে উত্তেজিত করিবার জন্য, সে সম্পত্তি-রক্ষা-সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া কথাটা পাড়িলামাত্র রমেশ বন্দুকের গুলি খাইয়া যুগ্মস্ত বাঘের মত গর্জিয়া উঠিয়া বলিল—“কি রোজরোজ চালাকি না কি! ভজুয়া?” তাহার এই অভাবনীয় এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উগ্রতায় ভৈরব ত্রস্ত হইয়া উঠিল; এই চালাকিটা যে কাহার, তাহা সে ঠাহর করিতেই পারিল না। ভজুয়া যমেশের গোরখপুর জেলার চাকর। অত্যন্ত বলবান্ এবং বিশ্বাসী। লাঠালাঠি করিতে সে রমেশেরই শিষ্য, নিজের হাত পাকাইবার জন্য রমেশ নিজে শিখিয়া ইহাকে শিখাইয়াছিল। ভজুয়া উপস্থিত হইবামাত্র রমেশ তাহাকে খাড়া জুহুম করিয়া দিল—সমস্ত মাছ কাড়িয়া আনিতে এবং যদি কেহ বাধা দেয়, তাহার তুল ধরিয়া টানিয়া আনিতে, যদি না আনা সম্ভব হয়, অস্তুতঃ তাহার একপাটি দাঁত ঘেন ভাঙ্গিয়া দিয়া সে আসে। ভজুয়া ত এই চায়। সে তাহার তেলেপাকানো লাঠি আনিতে নিঃশব্দে ঘরে গিয়া চুকিল। ব্যাপার দেখিয়া ভৈরব ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে বাঙলা দেশের তেলে-জলে মাছ। ঠাঁকাঠাঁকি, চোঁচোঁচিকি মোটে ভয় করে না; কিন্তু ঐ যে অতি দৃঢ়কার, বেঁটে হিন্দুস্থানীটা কথাটি কহিল না, শুধু ঘাড়টা একবার হেলাইয়া চলিয়া গেল, ইহাতে ভৈরবের তালু পর্ধান্ত হুশিয়ার্য শুকাইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, যে কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়। ভৈরব বাস্তবিক শুভানুধ্যায়ী, তাই সে জানাইতে আসিয়াছিল, যদি সময়মত অনুস্থানে উপস্থিত হইয়া সঁকার বঁকার চাঁৎকার করিয়া ছুটা কৈ-মাগুর ঘরে আনিতে পারা যায়। ভৈরব নিজেও ইহাতে সাহায্য করিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কৈ, কিছুই ত তাহার হইল না। গালি-

শালাজের ধার দিয়া কেহ গেল না। মনিব যদি না একটা হুকুম দিলেন, ভৃত্যটা তাহার ঠোঁটটুকু পর্যন্ত নাড়িল না, লাঠি আনিতে গেল। ভৈরব গরীব লোক; কোন্‌দারীতে জড়াইবার মত তাহার সাহসও ছিল না, সঙ্কল্পও ছিল না। যুদ্ধকাল পরেই সুদীর্ঘ বংশদণ্ড হাতে ভক্তুরা ঘরের বাহির হইল এবং সেই লাঠি মাথায় ঠেকাইয়া দূর হইতে রমেশকে নমস্কার করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই, ভৈরব অকস্মাৎ কাদিয়া উঠিয়া, রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিল—“ওরে ভোজো, বাস্‌নে! বাবা রমেশ, রক্ষে কর বাবা, আমি গরীব মানুষ, একদণ্ডও বাঁচব না।” রমেশ বিরক্ত হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। তাহার বিন্ময়ের সীমা-পরিমীমা নাই। ভক্তুরা অবাক হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভৈরব কঁাদকঁাদ স্বরে বলিতে লাগিল, “এ কথা ঢাকা থাকবে না, বাবা! যেসকল বাবুর কোপে পড়ে তাহ’লে একটা দিনও বাঁচব না। আমার ঘরদোর পর্যন্ত জ্বলে বাবে বাবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও রক্ষে করতে পারবে না।” রমেশ ঘাড় হেঁট করিয়া শুক হইয়া বসিয়া রহিল। গোলমাল শুনিয়া গোপাল সরকার খাতা ফেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, “কথাটা ঠিক বাবু।” রমেশ তাহারও কোন জবাব দিল না, শুধু হাত নাড়িয়া ভক্তুরাকে তাহার নিজের কাজে বাইতে আদেশ করিয়া নিজেও নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে কি ভীষণ ঝঞ্ঝার আকারেই এই ভৈরব আচার্য্যের অপরিমীম ভীতি ও কাতরোক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা শুধু অন্তর্যামাই দেখিলেন।

৭

“হাঁরে বতীন, খেলা করছিস্, ইকুলে বাড়িনে?” “আমাদের যে আজকাল ছ’দিন ছুটি দিদি!” মাসী শুনিতে পাইয়া কুৎসিত মুখে আরও বিদ্রী় করিয়া বলিলেন, “মুখপোড়া, ইকুলের মাসের

মধ্যে পনরদিন ছুটি। তুই তাই ওর গেছনে টাকা খরচ করিস্, আমি হ'লে আশুন ধরিয়ে দিচ্চুম।" বলিয়া নিজের কাছে চলিয়া গেলেন। ষোল-আমর বিশ্বাসবাদিনী বলিয়া বাহারা মালীর অধ্যাক্তি প্রচার করিত, তাহারাই ভুল করিত। এমনি একআধটা সত্যকথা বলিতেও তিনি পারিতেন, এবং আবশ্যক হইলে করিতেও পশ্চাৎ-পদ হইতেন না। রমা ছোট ভাইটিকে কাছে টানিয়া লইয়া, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ছুটি কেন রে, যতীন?" যতীন দিদির কোল ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমাদের ইস্কুলের চাল-ছাওয়া হচ্ছে যে! তার পর চূণকাম হবে—কত বই এসেচে, চারপাঁচটা চেয়ার-টেবিল, একটা আলমারী, একটা খুব বড় ঘড়ি—একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসো না, দিদি!" রমা অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, "বলিস্ কি রে!" "হাঁ, দিদি সত্য। রমেশবাবু এসেচেন না—তিনি সব ক'রে দিচ্ছেন।" বলিয়া বালক আশ্রিত কি কি বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু স্রুমে মাসীকে আসিতে দেখিয়া রমা তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আদর করিয়া কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া করিয়া এই ছোট ভাইটির মুখ হইতে সে রমেশ ও স্কুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিল। প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা করিয়া তিনি নিজে পড়াইয়া যান, তাহাও শুনি। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "হঁরে, যতীন, তোকে তিনি চিন্তে পান্নেন?" বালক সগর্বে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ—" "কি বলে তুই তাঁকে ডাকিস্?" এইবার যতীন একটু মুক্খিলে পড়িল। কারণ, এতটা ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য এবং সাহস আজও তাহার হয় নাই। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র দোৰ্দ্দণ্ডপ্রতাপ হেডমাষ্টার পর্যন্ত ঝেঁপুণ ভেঁট হইয়া পড়েন, তাহাতে ছাত্রমহলে ভয় এবং বিশ্বস্তের পরিসীমা থাকে না। ডাকাত দুরের কথা—ভয়সা করিয়া ইহারা কেহ তাহার মুখের দিকে চাহিতেই পারে না। কিন্তু দিদির কাছে লিপ্সন করাও শু নহে। ছেলেরা মাষ্টারদিগকে 'ছোটবাবু'

বলিয়া ডাকিতে শুনিয়াছিল। তাই, সে বুদ্ধিঘরচ করিয়া কহিল, “আমরা ছোটবাবু বলি।” কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া রমার বুদ্ধিতে কিছুই বাকী রহিল না। সে ভাইকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্তে কহিল, “ছোটবাবু কি রে। তিনি যে তোর দাদা হ’ন। বেণীবাবুকে যেমন ‘বড়দা’ ব’লে ডাকিস্, এঁকে এমনি ‘ছোটদা’ ব’লে ডাকতে পারিস্ নে?” বালক বিস্ময়ে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল—“আমার দাদা হন তিনি? সত্যি বল্চ দিদি?” “তাই ত হয় রে”—বলিয়া রমা আবার একটু হাসিল। আর যতীনকে ধরিয়া রাখা শক্ত হইয়া উঠিল। খবরটা সঙ্গীদের মধ্যে এখনি প্রচার করিয়া দিতে পারিলেই সে বাচে। কিন্তু ইকুল যে বন্ধ! এই ছোটো দিন তাহাকে কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তবে, যে সকল ছেলেরা কাছাকাছি থাকে, অন্ততঃ তাহাদিগকে না বলিয়াই বা সে থাকে কি করিয়া? সে আর একবার ছটফট করিয়া বলিল, “এখন বাব, দিদি?” “এত বেলা কোথায় বাব রে?” বলিয়া রমা তাহাকে ধরিয়া রাখিল। যাইতে না পারিয়া যতীন খানিকক্ষণ অপ্রসন্নমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এত দিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি?” রমা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, “এত দিন লেখাপড়া শিখিতে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হ’লে তাকেও এমনি বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারাবি থাকতে, যতীন?” বলিয়া ভাইটিকে সে আর একবার বুকের কাছে আকর্ষণ করিল। বালক হইলেও সে তাহার দিদির কণ্ঠস্বরের কি রকম একটা পরিবর্তন অনুভব করিয়া বিস্মিতভাবে মুখপানে চাহিয়া রহিল। কারণ, রমা তাহার এই ভাইটিকে প্রাণতুলা ভালবাসিলেও তাহার কথায় এবং ব্যবহারে এরূপ আবেগ উচ্ছ্বাস কখন প্রকাশ পাইত না।

যতীন প্রশ্ন করিল, “ছোটদা’র সমস্ত গড়া শেব হয়ে গেছে,

দিদি ?” রমা তেমনি স্নেহকোমলকণ্ঠে জবাব দিল—“হাঁ ভাই, তাঁর সব পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।” যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, “কি ক’রে তুমি জানলে ?” প্রত্যুত্তরে রমা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িল। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে সে, কিংবা গ্রামের আর কেহ, কিছুই জানিত না। তাহার অনুমান যে সত্য হইবেই, তাহাও নয়, কিন্তু তেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল, যে ব্যক্তি পরের ছেলের লেখাপড়ার জন্ত এই অত্যন্তকালের মধ্যে এরূপ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সে কিছুতেই নিজে মূর্থ নয়।

যতীন এ লইয়া আর জেদ করিল না। কারণ, ইতিমধ্যে হঠাৎ তাহার নাপার মধ্যে আর একটা প্রশ্নের আকর্ষণ হইতেই, চট করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, “আচ্ছা, দিদি, ছোটনা, কেন আমাদের বাড়ী আসেন না ? ওঁরা তো রোজ আসেন।” প্রশ্নটা ঠিক যেন একটা আকস্মিক তীক্ষ্ণ বাধার মত রমার নর্সীকে বিভ্রাৎবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। কিন্তু, তথাপি হাসিয়া কহিল, “তুই তাঁকে তেকে অন্তে পারিস্ নে ?” “এখনি যাব দিদি ?” বলিয়া তৎক্ষণাৎ যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল। “ওরে কি পাংলা ছেলে রে তুই !” বলিয়া রমা চক্ষের পলকে তাহার ভগ্নবাকুল হই বাহঁ বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। “থপরদার, যতীন—কথখনো এমন কাজ করিস্নে, ভাই, কথখনো না।” বলিয়া ভাইটিকে সে যেন প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। তাহার অতি দ্রুত হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করিয়া যতীন, বালক হইলেও, এবার বড় বিষয়ে মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। একে ত, এমন ধারা করিতে কখনও সে পূর্বে দেখে নাই, তা’ ছাড়া, ছোট বাবুকে ছোটনালা বলিয়া জানিয়া যখন তাহার নিজের মনের গতি সম্পূর্ণ অস্ত্র পথে গিয়াছে, তখন দিদি কেন যে তাঁহাকে এত ভয় করিতেছে, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। এমন সময়ে সন্ধ্যার তীক্ষ্ণ আলোক কানে আসিতেই রমা, যতীনকে ছাড়িয়া দিয়া

ভাড়াভাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ‘অনতিকাল পরে’ তিনি স্বয়ং আসিয়া ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, “আমি বলি, বুঝি রমা ঘাটে চান করতে গেছে। বলি, একাঙ্গী ব’লে কি এতটা বেলা পর্যন্ত মাথার একটু তেলজলও দিতে হবে না? মুখ শুকিয়ে যে একেবারে কালীবর্ণ হয়ে গেছে।” রমা, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া, বলিল, “তুমি যাও, মাসী, আমি এখনি যাচ্ছি।” “বাবি আর কখন? বেরিয়ে দেখ্‌গে যা, বেশীরা মাছ ভাগ করতে এসেচে।” মাছের নামে যতীন ছুটিয়া চলিয়া গেল। মাসীর অলক্ষ্যে রমা আঁচল দিয়া মুখখানা একবার জোর করিয়া মুছিয়া লইয়া, তাঁহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণের উপর মহাকোলাহল। মাছ নিত্যন্ত বন্দ ধরা পড়ে নাই—একটা বড় বুড়ির প্রায় একবুড়ি। ভাগ্যবানদিগের অল্প বেণী নিজেই হাজির হইরাছেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা আর কোথাও নাই—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে।

কাসির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই, “কি মাছ পড়ল হে বেণী!” বলিয়া লাঠি হাতে ধর্মদাস প্রবেশ করিলেন। “তেমন আর কই পড়ল!” বলিয়া বেণী মুখখানা অগ্রসর করিল। জেলেকে ডাকিয়া কহিল, “আর দেরি কর্‌চিস্ কেন রে? শীগ্‌গীর ক’রে ছুভাগ ক’রে ফেল্‌ না।” জেলে ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

“কি হচে গো, রমা? অনেক দিন আস্তে পারিনি; বলি, ঘরের আমার খবরটা একবার নিয়ে যাই”—বলিয়া গোবিন্দ গাঙুলী বাড়ী ছুকিলেন। “আসুন”—বলিয়া রমা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল। “এত ভিড় কিসের গো?” বলিয়া গাঙুলী অগ্রসর হইয়া আসিয়া হঠাৎ যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—“ইস্! তাই ত গো—মাছ বড় মন্দ ধরা পড়েনি দেখ্‌চি। বড়পুকুরে জাল দেওয়া হ’ল বুঝি?” এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সকলেই বাহুল্য মনে করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে প্রতি-বুঝিয়া রহিল; এক অনক্ষণে

মধ্যেই তাহা সমাধা হইয়া গেল। বেশী নিজের অংশের গ্রাস সমস্তটুকুই চাকরের মাথার তুলিয়া দিয়া দীবরের প্রতি একটা চোখের ইঙ্গিত করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমনের উজোগ করিলেন; এবং মুখুযোদের প্রয়োজন অন্ন বলিয়া রমার অংশ হইতে উপস্থিত সকলেই যোগ্যতা-অনুসারে কিছু-কিছু সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, রমেশ ঘোষালের সেই বেঁটে হিন্দুস্থানী চাকরটা তাহার মাথায় সমান উঁচু বাঁশের লাঠি হাতে একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই লোকটার চেহারা এমনি দুঃখময়ের মত যে সকলের আগে সে চোখে পড়েই এবং একবার পড়িলেই মনে থাকে। গ্রামের ছেলে বুড়া সবাই তাহাকে চিনিয়া লইয়াছিল; এমন কি, তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ আশঙ্কণি গল্পও দীরে দীরে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। শোকটা এত লোকের মাঝখানে রমাকেই যে কি করিয়া কত্রী বলিয়া চিনিল, তাহা সেই জানে, দূর হইতে মত্ত একটা সেলাম করিয়া, ‘মা-জী’ বলিয়া সম্বোধন করিল, এবং কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা যেমনই হোক, কণ্ঠস্বর সত্যই ভয়ানক;—অত্যন্ত মোটা এবং ভাঙা। আর একটা সেলাম করিয়া হিন্দি-বাঙ্গালা-মেশানো ভাষায় সংক্ষেপে জানাইল, সে রমেশ বাবুর ভৃত্য, এবং মাছের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। রমা বিশ্বাসের প্রভাবেই হোক বা তাহার সঙ্গত প্রার্থনার বিরুদ্ধে কথা খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্যই হোক—সহসা উত্তর করিতে পারিল না। লোকটা চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া বেগীর ভৃত্যকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বস্তির গলায় বলিল, “এই বাও মাং।” চাকরটা ভয়ে-চার পা সিঁচাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। আরম্ভিনিষ্ট পর্য্যন্ত কোথাও একটু দৃষ্টি নাই; তখন বেশী দূর হইয়া গেলেন। বেখানে ছিলেন, সেই-দিকে হইতে বলিলেন—“কিহের জাঙ্ক?” জবাব দিতে পারিল না।

একটা সেলাম দিয়া সঙ্গমে কহিল, “বাবুজী, আপকো নাহি পুছা।” মাসী অনেক দূর রকের উপর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বন্ধন করিয়া বলিলেন, “কি রে বাপু, মারবি না কি!” ভজুরা একমুহূর্তে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল; পরক্ষণেই তাহার ভাঙা গলার জরুর হাতিতে বাড়ী ভরিয়া উঠিল। খানিক পরে হাসি থামাইয়া যেন একটু লজ্জিত হইয়াই পুনরায় রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, ‘মা-জী?’ তাহার কথায় এবং ব্যবহারে অতিশয় সঙ্গমের ভিতরে যেন অবজ্ঞা লুকান ছিল। রমা ইহাই কল্পনা করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার কথা কহিল। বলিল, “কি চায় তোর বাবু?” রমার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া ভজুরা হঠাৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাই যতদূর সাধ্য, সেই কক্কশকণ্ঠ কোমল করিয়া তাহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিল। কিন্তু করিলে কি হয়—মাছ ভাগ হইয়া যে বিলি হইয়া গিয়াছে। এতগুলো লোকের সম্মুখে সে হীন হইতেও পারে না।—তাই কটুকণ্ঠে কহিল—“তোর বাবুর এতে কোন অংশ নেই। বল্গে যা, যা’ পারে, তাই করুক গে”! “বহুৎ আচ্ছা, মা-জী।” বলিয়া ভজুরা তৎক্ষণাৎ একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া বেগীর ভূতাকে হাত নাড়িয়া ঘাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিল, এবং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া নিজেও প্রস্থানের উপক্রম করিল। তাহার ব্যবহারে বাড়ীপুত্র সকলেই যখন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে তখন হঠাৎ সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রমার মুখের দিকে চাহিয়া, হিন্দি-বাক্যে মিশাইয়া নিজের কঠোর কণ্ঠস্বরের জন্ত ক্ষমা চাহিল, এবং কহিল, “মা-জী, লোকের কথা শুনিয়া পুকুর-ধার হইতে মাছ কাড়িয়া আনিবার জন্ত বাবু আমাকে লুকুণ করিয়া-ছিলেন! বাবু-জী কিংবা আমি কেহই আমরা মাছ-মাংস ছুঁই না বটে, কিন্তু—” বলিয়া সে নিজের প্রশস্ত বকের উপর করাঘাত করিয়া কহিল, “বাবুজীর লুকুমে এই জীউ হয় ত পুকুরধারেই আজ দিতে হইত। কিন্তু রামজী রক্ষা করিয়াছেন; বাবুজীর রাগ পড়িয়া



গেল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “ভজুরা, যা, মা-জীকে জিজ্ঞাসা ক’রে আর, ও পুকুরে আমার ভাগ আছে কি না।” বলিয়া স্বে-অতি সজ্জমের সহিত লাঠিগুচ্ছ দুই হাত রমার প্রতি উখিত করিয়া নিজেই মাথায় ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, “বাবুজী বলিয়া দিলেন—আর যে ঘাই বলুক, ভজুরা আমি নিশ্চয় জানি, মা-জীর জবান থেকে কখনও বুটাবাত বা’র হবে না—সে কখনও পরের জিনিষ ছোঁবে না।” বলিয়া সে আন্তরিক সজ্জমের সহিত বারংবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাইবামাত্রই বেণী মেরেলি সরু গলায় আঁফালন করিয়া কহিল, “এমনি ক’রে উনি বিষয় রক্ষে করবেন! এই তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞে করুচি, আমি আজ থেকে গড়ের একটা শামুক-গুগলিতেও ওকে হাত দিতে দেব না; বুঝ্লে না রমা!” বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া হিঃ—হিঃ—করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। রমার কানে কিন্তু ইহার একটা কথাও প্রবেশ করিল না। ‘মা-জীর মুখ হইতে কখনো বুটাবাত বাহির হইবে না’ ভজুরার এই বাক্যটা তখন তাহার দুই কানের ভিতর লক্ষ করতালির সমবেত ঝামাঝম শব্দে যেন মাথাটা ছেঁচিয়া কেলিতেছিল। তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্ত রাঙা হইয়াই এমনি সাদা হইয়া গিয়াছিল, যেন কোথাও এক ফোটা রক্তের চিহ্ন পর্যাস্ত নাই। শুধু এই জ্ঞানটা তাহার ছিল, যেন এ মুখের চেহারাটা কাহানও চোখে না পড়ে। তাই সে মাথার আঁচলটা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

“জ্যাঠাইমা!”

“কে, রমেশ? আর, বাবা ঘরে আর।” বলিয়া আহ্লাদ করিয়া বিধেখরী তাড়াতাড়ি একখানি বাছুর পাতিয়া দিলেন। ঘরে পা দিয়াই রমেশ চমকিত হইয়া উঠিল। কারণ,

জ্যাঠাইনার কাছে যে জীলোকটি বসিয়াছিল, তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিল—এ রমা। তাহার ডারি একটা চিত্তজ্বালার সহিত মনে হইল, ইহারা মাসীকে মাঝখানে রাখিয়া অপমান করিতেও ক্রটি করে না, আবার নিতান্ত নিলজ্জার মত নিভৃত্তে কাছে আসিয়াও বসে। এদিকে রমেশের আকস্মিক অভ্যাগমে রমারও অবস্থাসঙ্কট কম হয় নাই। কারণ, শুধু যে সে এ গ্রামের মেয়ে, তাই নয়; রমেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটাও এইরূপ যে, নিতান্ত অপরিচিতার মত ঘোমটা টানিয়া দিতেও তাহার লজ্জা করে, না দিয়াও সে স্বস্তি পায় না। তা ছাড়া সেদিন মাছ লইয়া একটা কাণ্ড ঘটয়া গেল। তাই সবদিক্ বাঁচাইয়া বতটা পারা যায়, সে আড় হইয়া বসিয়াছিল। রমেশ আর সে দিকে চাহিল না। ঘরে যে আর কেহ আছে, তাহা একেবারে অগ্রাহ করিয়া দিয়া, বীরে স্নেহে মাতৃরের উপর উপবেশন করিয়া কহিল, “জ্যাঠাইমা!” জ্যাঠাইমা বলিলেন, “হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে, রমেশ?” রমেশ কহিল, দুপুরবেলা না এসে তোমার কাছে যে একটু বসতে পাইনে। তোমার কাজ ত কম নয়!” জ্যাঠাইমা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন। রমেশ মুহূর্ত্ত হাসিয়া কহিল, “বহুকাল আগে ছেলেবেলায় একবার তোমার কাছে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলুম। আবার আজ একবার নিতে এলুম। এই হয় ত শেষ নেওয়া, জ্যাঠাইমা!” তাহার মুখের হাসি সবেও কণ্ঠস্বরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এমনই একটা গভীর অদগাদ প্রকাশ পাইল যে, উত্তরেই বিস্মিত-বাণীর চমকিয়া উঠিলেন।

“বালাই, যাট! ও কি কথা, বাপু!” বলিয়া বিম্বেশ্বরীর চোখখুঁটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল। রমেশ শুধু একটু হাসিল। বিম্বেশ্বরী মেহার্দ্ৰকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, “শরীরটা কি এখানে ভাল থাক্চে না,—বাবা?”—রমেশ নিজের স্নেহীর্ষ এবং অত্যন্ত বলশালী দেহের পানে বার দুই দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, “এ যে

খোঁটার দেশের ডাল-রুটির দেহ জ্যাঠাইমা, এ কি এত শীঘ্রই খারাপ হয়? তা' নয় শরীর আমার বেশ ভালই আছে, কিন্তু এখানে আমি আর একদণ্ডও টিকতে পারছি নে, সমস্ত প্রাণটা বেন আমার থেকে-থেকে খাবি খেয়ে উঠছে।" শরীর খারাপ হয় নাই শুনিয়া, বিবেকবান নিশ্চিন্ত হইয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই তোমার জন্মস্থান—এখানে টিকতে পারচিসনে, কেন বল দেখি? রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে আমি বলতে চাইনে। আমি জানি, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত জানো।" বিবেকবান কখনো মৌন থাকিয়া একটু গভীর হইয়া বলিলেন, "সব না জানলেও কতক জানি বটে। কিন্তু, সেই জন্তেই ত বলছি, তোমার আর কোথাও গেলে চলবে না, রমেশ?" রমেশ কহিল, "কেন চলবে না, জ্যাঠাইমা? কেউ ত এখানে আমাকে চায় না?" জ্যাঠাইমা বলিলেন, "চায় না বলেই ত তোকে আর কোথাও পালিয়ে যেতে আমি দেব না। এই যে ডাল-রুটি খাওয়া দেহের বড়াই করছিলি রে, সে কি পালিয়ে যাবার জন্তে?" রমেশ চুপ করিয়া রহিল। আজ কেন যে তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া গ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার একটু বিশেষ কারণ ছিল। গ্রামের যে পথটা বরাবর ষ্টেশনে গিয়া পৌছিয়াছিল, তাহার একটা জায়গা আটদশ বৎসর পূর্বে বৃষ্টির জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ভাঙনটা ক্রমাগত দীর্ঘতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রায়ই জল জমিয়া থাকে—স্থানটা উত্তীর্ণ হইতেই সকলকেই একটু দুর্ভাবনার পড়িতে হয়। অল্প সময়ে কোনমতে পা টিপিয়া, কাপড় তুলিয়া, অতি সতর্পণে ইহারা পার হয়; কিন্তু বর্ষাকালে আর কষ্টের অবধি থাকে না। কোন বছর বা দুটা বাঁশ কেলিয়া দিয়া, কোন বছর বা একটা ভাঙা তালের ডোঙা উপুড় করিয়া দিয়া, কোনমতে তাহারই সাহায্যে ইহারা পার হইয়া যায়; হাত পা ভাঙ্গিয়া ওপারে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু

এত দুঃখস্বপ্নেও গ্রামবাসীরা আজ পর্যন্ত তাহার সংস্কারের চেষ্টা  
 মাত্র করে নাই। মেরামত করিতে টাকাকুড়ি ব্যয় হওয়া সম্ভব। এই  
 টাকাটা রমেশ, নিজে না দিয়া চাঁদা তুলিবার চেষ্টায় আটদশ দিন  
 পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু আটদশটা পয়সা কাহারো কাছে বাহির  
 করিতে পারে নাই। শুধু তাই নয়—আজ সকালে ঘুরিয়া আসি-  
 বার সময়, পথের ধারে শ্রমিকদের দোকানের ভিতরে এই প্রসঙ্গ  
 হঠাৎ কাণে যাওয়ায়, সে বাহিবে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইল, কে  
 একজন আর একজনকে হাসিয়া বলিতেছে, “একটা পয়সা কেউ  
 ভোঁরা দিসনে। দেখচিসনে ওর নিজের গরজটাই বেশী? জুতো  
 পারে মসমসিয়ে চলা চাই কিনা! না দিলে, ও আপনি সারিয়ে  
 দেবে তা’ দেখিস। তা’ ছাড়া, এতকাল যে ও ছিল না আমাদের  
 ইষ্টাশান যাওয়া কি আটকে ছিল? কে আর একজন কহিল,  
 সব্ব কর না হে! চাটুয্যে মশায় বল্ছিলেন, ওর মাথায় হাত  
 বুলিয়ে শীতলাঠাতুরের ঘরটাও ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে।  
 খোসামোর ক’রে ছুটো ‘বাবু’ ‘বাবু’ করুতে পারলেই বাস! তখন  
 হইতে সারা-সকালবেলাটা এই ছুটো কথা তাহাকে যেন আগুন  
 দিয়া পোড়াইতেছিল। জ্যাঠাইমা ঠিক এই স্থানটাতেই ঘা  
 দিলেন। বলিলেন, “সে ভাঙনটা যে সারাবার চেষ্টা কর্ছিলি,  
 তাব কি হ’ল?” রমেশ বিরক্ত হইয়া কহিল, “সে হবে না,  
 জ্যাঠাইমা—কেউ একটা পয়সা চাঁদা দেবে না।” বিশেষরূপে  
 হাসিয়া বলিলেন, “দেবে না বলে হবে না রে! তোর দাদামশায়ের  
 তুই অনেক টাকা পেয়েচিস—এই ক’টা টাকা তুই ত নিজেই  
 দিতে পারিস!” রমেশ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। কহিল,  
 “কেন দেব? আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে যে, না বুঝে অনেকগুলো  
 টাকা এদের ইস্কুলের জন্ত খরচ করে ফেলেছি। এ গাঁয়ের কারো  
 জন্তে কিছু করুতে নেই।” রমার দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া  
 লইয়া বলিল,—“এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে; ভাল

করুলে গরজ ঠাওরায়। কমা করাও মহাপাপ; ভাবে—ভয়ে পেছিরে গেল।” জ্যাঠাইমা খুব হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু রমার চোখমুখ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। রমেশ রাগ করিয়া কহিল, “হাসিলে যে জ্যাঠাইমা?” “না হেসে করি কি বল ত বাছা?” বলিয়া সহসা একটা নিখাস ফেলিয়া বিধেখরী বলিলেন, “বরং আমি বলি, তোরই এখানে থাকা সবচেয়ে দরকার। বাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলল যেতে চাচ্ছি, রমেশ, বল দেখি তোর রাগের যোগ্য লোক এখানে আছে কে?” একটু থামিয়া, কতটা, যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন—“আহা! এরা যে কত হুঃখী, কত দুঃখী—তা’ যদি জানিস, রমেশ, এদের ওপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হবে। ভগবান যদি দয়্য করে তোকে পাঠিয়েছেন—তবে এদের মাঝখানেই তুই থাক, বাবা।” “কিন্তু, এরা যে আমাকে চায় না, জ্যাঠাইমা!” জ্যাঠাইমা বলিলেন, “তাই থেকেই কি বুঝতে পারিসনে, বাবা, এরা তোর বাগ অভিমানের কত অযোগ্য? আর শুধু এরাই নয়—যে গ্রামে ইচ্ছে ঘুরে আর দেখবি সমস্তই এক।” সহসা রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি যে সেই থেকে বাড়ি হেঁট করে চুপ করে বসে আছ, মা?—হ্যাঁ, রমেশ, তোরা দু’ভাই বোনে কি কথা-বার্তা বলিসনে? না, মা, সে কোরো না। ওর বাপের সঙ্গে তোমাদের যা’ হয়ে গেছে, সে ঠাকুরপোর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। সে নিয়ে তোমরা দুজন মনান্তর করে থাকলে ত কিছুতে চলবে না।” রমা মুখ নীচু করিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, “আমি মনান্তর রাখতে চাইনে, জ্যাঠাইমা। রমেশদা”—অকস্মাৎ তাহার স্বদুঃকণ্ঠ রমেশের গম্ভীর উদ্ভগ্ন কণ্ঠস্বরে ঢাকিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “এর মধ্যে তুমি কিছুতে থেকে না মা। জ্যাঠাইমা। সেদিন কোনগতিকে গুর মাসীর হাতে প্রাণে বেঁচেচ; আজ আবার উনি গিয়ে যদি তাঁকে পাঠিয়ে দেন—একেবারে

তোমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে তবে তিনি বাড়ী ফিরবেন। বলিয়াই কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদে অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

বিশেষরূপী চোচাইয়া ডাকিলেন, “বাস্লে, রমেশ, কথা শুনে যা।” রমেশ দ্বারের বাহির হইতে বলিল, “না, জ্যাঠাইমা—মার অহঙ্কারের স্পর্ধায় তোমাকে পর্য্যন্ত পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলে, তাদের হয়ে একটি কথাও তুমি বোলো না—” বলিয়া তাঁহার দ্বিতীয় অনুরোধের পূর্বেই চলিয়া গেল। বিহবলের মত রমা করেক মুহূর্ত্ত বিশেষবীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—“এ কলঙ্ক আমার কেন জ্যাঠাইমা? আমি কি মাসীকে শিখিয়ে দিই, না, তার জন্তে আমি দায়ী?” জ্যাঠাইমা হাতের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সম্মুখে বলিলেন, “শিখিয়ে যে দাও না, এ কথা সত্যি। কিন্তু, তাঁর জন্তে দায়ী তোমাকে কতকটা হ’তে হয় বলাক না!” রমা অগ্নি হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ অভিমানে সতেজ অশ্রুকার করিয়া বলিল, “কেন দায়ী? কথখনো না। আমি সে এর বিন্দুবিসর্গও জান্‌তাম না, জ্যাঠাইমা! তবে কেন আমাকে উনি, মিথ্যে দোষ দিয়ে, অপমান ক’রে গেলেন?” বিশেষরূপী ইহা মটয়া আর তর্ক করিলেন না। ধীরভাবে বলিলেন, “সকলে ত ভেতরের কথা জান্‌তে পারে না, না। কিন্তু তোমাকে অপমান করবার ইচ্ছে এর কখনো নেই, এ কথা তোমাকে আমি নিশ্চয় বলতে পারি। তুমি ত জান না, মা, কিন্তু আমি গোপাল সরকারের মুখে শুনে টের পেয়েছি, তোমার ওপর ওর কত প্রজ্ঞা, কত বিশ্বাস। সেদিন তেঁরুণগাছটা কাটিয়ে ছ’ঘরে যখন ভাগ ক’রে নিলে, তখন ও ক’রো কথার কাণ দেয়নি যে; ওর তা’তে অংশ ছিল। তাদের মুখের উপর হেসে বলেছিল, চিন্তার কারণ নেই— রমা বখন আছে, তখন আমার জ্ঞায্য অংশ আমি পাবই; লে কখনো পরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না। আমি ঠিক জানি,

মা, এত বিবাহ-বিসংবাদের পরেও তোমার ওপর ওর সেই বিশ্বাসই ছিল, যদি না সেদিন গড়পুকুরের—” কথাটার মাঝখানেই বিবেচনারী সহসা ধামিরা গিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে কিছুক্ষণ ধরিয়া রমার আনত শুকমুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, “আজ একটা কথা বলি, মা, তোমাকে। বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করার দাম যতই হোক রমা, এই রমেশের প্রাণটার দাম তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি। কারো কথায়, কোন বস্তুর লোভেতেই, মা সেই জিনিস-টিকে তোমরা চারিদিকে থেকে যা মেরে-মেরে নষ্ট ক’রে ফেলো না। দেশের যে ক্ষতি তাতে হবে, আমি নিশ্চয় বলছি তোমাকে, কোন কিছু দিয়েই আর তার পূরণ হবে না।” রমা স্থির হইয়া বাসিয়া রহিল, একটি কথারও প্রতিবাদ করিল না। বিবেচনারীও তার কিছু বলিলেন না। খানিক পরে রমা অস্পষ্ট মুহুর্তে কহিল,—“বেলা গেল, আজ বাড়ী যাই, জ্যাঠাইমা!” বলিয়া প্রণাম করিয়া, পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া চলিয়া গেল।

যত রাগ করিয়াই রমেশ চলিয়া আসুক, বাড়ী পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাহার সমস্ত উত্তাপ যেন জল হইয়া গেল। সে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল,—“এই সোজা কথাটা না বুঝিয়া কি কষ্টই না পাইতেছিলাম। বাস্তবিক, রাগ করি তাহার উপর? যাহারা এতই সংকীর্ণভাবে স্বার্থপর যে, স্বার্থ মঙ্গল কোণায়, তাহা চোখ মেলিয়া দেখিতেই জানে না, শিক্ষার অভাবে তাহারা এমনি অন্ধ যে, কোনমতে প্রতিবেশীর বলঙ্গ্য করাটাকেই নিজেদের বল-সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, তাহাদের উপর অভিমান করার যত লজ আর ত কিছু হইতে পারে না।” তাহার মনে গড়িল, ঘুরে সহরে বসিয়া সে বই পড়িয়া, কানে গল্প শুনিয়া,

কল্পনা করিয়া, কতবার ভাবিয়াছে, ‘আমাদের বাঙ্গালী জাতির আর কিছু যদি না থাকে ত নিভৃত গ্রামগুলি সেই শান্তি-স্বচ্ছন্দতা আজও আছে, যাহা বহুজনাকীর্ণ সহরে নাই। সেখানে স্বল্পসংখ্যে, সরল গ্রামবাসীরা সহায়ভূতিতে গলিয়া যায়, একজনের দুঃখে আর একজন বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের গুণে আর একজন অনাহুত উৎসব করিয়া যায়। শুধু সেইখানে, সেই সব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙ্গালী সভ্যতাব্যবস্থা অক্ষয় হইয়া আছে।’ হাস রে! এক ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার সহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এত পরিশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই! আর সে কপাট মনে পড়িতে তাহার সর্বাস্ব বহিয়া যেন অসংখ্য সন্ন্যাস চলিয়া বেড়াইতে লাগিল। নগরের সম্মুখ চঞ্চল পথের ধারে যখনই কোন পাথরের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে; তখনই সে মনে করিয়াছে, কোনমতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোটগ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এই সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের বৃত্ত রেহাই পাইয়া বাঁচিবে। সেখানে যাহা সকলের বড়—সেই ধর্ম আছে, এবং সামাজিক চরিত্রও আজি সেখানে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে! হা ভগবান! কোথায় সেই চরিত্র? কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে! ধর্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছে কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য-সমাজ যে বথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহারি বিষাক্ত পুতি-সকলময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশ অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে! অথচ সর্বোপেক্ষা মর্মান্তিক পরিহাস এই যে, জাতিধর্ম নাই বলিয়া সহরের প্রতি ইহাদের অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধাও অস্ত নাই!

• রমেশ বাড়ীতে পা দিতেই দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে একটি প্রৌঢ়া জীলোক একটি এগারো বারো বছরের ছেলেকে লইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছু না জানিয়া



শুধু ছেলেটির মুখ দেখিয়াই রমেশের বৃকের ভিতরটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। গোপাল সরকার চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া লিখিতে-ছিল; উঠিয়া আসিয়া কহিল,—“ছেলেটি দক্ষিণ পাড়ার দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষের জন্তে এসেচে।” ভিক্ষার নাম শুনিয়াই রমেশ অগিয়া উঠিয়া বলিল, “আমি কি শুধু ভিক্ষা দিতেই বাড়াই এসেছি, সরকার মশায়? গ্রামে কি আর লোক নেই?” গোপাল সরকার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “সে ত ঠিক কথা বাবু! কিন্তু কর্তা ত কখনও কারুকে ফেরাতেন না; তাই, দায়ে পড়িলেই, এই বাড়ীর দিকেই লোকে ছুটে আসে।” ছেলেটির পানে চাহিয়া পোতাটিকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিল,—“হঁ। কামিনীর মা, এদের দোষও ত কম নয়, বাছা! জ্যাস্ত থাকতে প্রায়শ্চিত্ত করে দিলে না, এখন মড়! যখন উঠে না, তখন টাকার জন্তে ছুটে বেড়াচ্ছে! ঘরে ঘটিটা বাটিটাও কি নেই বাপু?” কামিনীর মা জাতিতে সদগোপ। এই ছেলেটির প্রতিবেশী। মাথা নাড়িয়া বলিল,—“বিয়েস না হয়, বাপু, গিরে দেখে চল। আমার কিছু থাকলেও কি মরা বাপ কেলে একে ভিক্ষে করতে আনি? চোখে না দেখলেও শুনেচ ত সব? এই ছমাস ধরে আমার বথাসর্ব্ব এই জন্তই ঢেলে দিয়েছি। বলি, ঘরের পাশে বামুনের ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরবে!” রমেশ এইবার ব্যাগারটা কতক যেন অনুমান করিতে পারিল। গোপাল সরকার তখন বুঝাইয়া কহিল,—“এই ছেলেটির বাপ—দ্বারিক চক্রবর্তী, ছয়মাস হইতে কাসরোগে শয্যাগত থাকিয়া, আজ ভোরবেলায় মরিয়াছে; প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া, কেহ শব্দস্পর্শ করিতে চাহিতেছে না—এখন সেইটা করা নিত্যন্ত প্রয়োজন। কামিনীর মা গত ছয়মাসকাল তাহার সর্ব্ব এই নিঃশ্বাস্ত্রাঙ্গ-পরিবারের জন্য ব্যয় করিয়া কেলিয়াছে। আর তাহারও কিছু নেই। সেই জন্ত ছেলেটিকে লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছে।”

রমেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, “বেলা ত প্রায় ছোটো বাজে। যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয়, মড়া পড়েই থাকবে?” সরকার হাসিয়া কহিল,—“উপায় কি বাবু? অশান্তর কাজ ত আর হ’তে পারে না! আর এতে পাড়ার লোককেই বা দোষ দেবে কে, বলুন?—যা হোক, মড়া প’ড়ে থাকবে না; যেমন ক’রে হোক, কাজটা ওদের করতেই হবে। তাই ত ভিক্ষে—হাঁ কামিনীর মা, আর কোথাও গিয়েছিলে?” ছেলেটি মুঠা খুলিয়া একটি সিকি ও চারিটা পয়সা দেখাইল।—কামিনীর মা কহিল, “সিকিটি মুখ্যোরা দিয়েচে, আর পয়সা চারটি হালদার মশাই দিয়েচেন; কিন্তু যেমন ক’রে হোক ন’সিকের কমে ত হবে না। তাই, বাবু যদি”—রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, “তোমরা বাড়ী যাও বাপু, আর কোথাও যেতে হবে না! আমি এখনি সমস্ত বন্দোবস্ত ক’রে, লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।” তাদের বিদায় করিয়া দিয়া রমেশ, গোপাল সরকারের মুখের প্রতি অত্যন্ত ব্যথিত হই চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল,—“এমন গরীব এ গাঁয়ে আর কয়ঘর আছে, জানেন আপনি?” সরকার কহিল,—“হ’তিন ঘর আছে, বেশী নেই। এদেরও মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল, বাবু; শুধু একটা চালদা গাছ নিজে মামলা ক’রে ষারিক চক্কোস্তি আর সনাতন হাজরা, হ’ঘরেই বছরপাঁচেক আগে শেষ হ’য়ে গেল।” গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল,—“এতদূর গড়াত না, বাবু, শুধু আমাদের বড় বাবু, আর গোবিন্দ গাঙ্গুলীই, হ’জনকেই নাচিয়ে তুলে এতটা ক’রে তুললেন।” “তার পরে?” সরকার কহিল,—“তার পর, আমাদের বড়বাবুর কাছেই হুঘরের গলা পর্যন্ত এতদিন বাধা ছিল। গত বৎসর উনি হুদে-আসলে সমস্তই কিনে নিয়েচেন। হাঁ, চাবার মেয়ে বটে ওই কামিনীর মা।... অপমরে বাবুনের যা করলে, এমন দেখতে পাওয়া যায় না।” রমেশ, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পর, গোপাল

সরকারকে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া, মনে মনে বলিল—“তোমার আদেশই মাথায় তুলে নিলাম, জ্যাঠাইমা! মরি এখানে, সেও ঢের ভাল, কিন্তু এ দুর্ভাগ্য গ্রামকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইব না।”

মাস তিনেক পরে একদিন সকালবেলা তারকেশ্বরের যে পুকুরিণীটিকে দুধপুতুর বলে, তাহারই সিঁড়ির উপর একটি রমণীর সহিত রমেশের একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। ক্ষণকালের জন্ত সে এমনি অভিভূত, অভদ্রভাবে তাহার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল যে, তাহার তৎক্ষণাৎ পথ ছাড়িয়া সরিয়া বাইবার কথা মনেই হইল না। মেয়েটির বয়স, বোধ করি, কুড়ির অধিক নয়। স্নান করিয়া উপরে উঠিতেছিল। তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিন্ধু-বসনতলে দুই বাহু বুকের উপর জড় করিয়া, মাথা হেঁট করিয়া মুছকণ্ঠে কহিল,—“আপনি এখানে যে?” রমেশের বিন্ময়ের অবধি রহিল না; কিন্তু তাহার বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি আমাকে চেনেন?” মেয়েটি কহিল,—“চিনি। আপনি কখন তারকেশ্বরে এলেন?” রমেশ বলিল, “আজই ভোরবেলা। আমার মামার বাড়ী থেকে মেয়েদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা আসেন নি।” “এখানে কোথায় আছেন?” রমেশ কহিল,—“কোথাও না। আমি আর কখনো এখানে আসিনি। কিন্তু আজকের দিনটা কোনমতে কোথাও অপেক্ষা ক’রে থাকতেই হবে। যেখানে হোক, একটা আশ্রয় খুঁজে নেব।” “সঙ্গে চাকর আছে ত?” “না, আমি একাই এসেছি।” “বেশ বা হোক” বলিয়া মেয়েটি হাসিয়া হঠাৎ মুখ তুলিতেই, আবার দুজনের চোখোচোখি হইল। সে চোখ নামাইয়া লইয়া মনে মনে, বোধ করি, একটু ইতস্ততঃ

করিয়া শেষে কহিল, “তবে আমার সঙ্গেই আছেন” বলিয়া ঘটিটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। রমেশ বিপদে পড়িল। কহিল,—“আমি যেতে পারি, কেন না, এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই ডাক্তেন না। আপনাকে আমি যে চিনি না, তাও নয়; কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পাচ্ছি। আপনার পরিচয় দিন।” “তবে মন্দিরের বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি পূজোটা সেয়ে মিই। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব” বলিয়া মেয়েটি মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল। রমেশ মুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল। এ কি ভীষণ, উদ্দান যৌবনলীলা ইহার আর্য বসন বিলীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল। তাহার মুখ, গঠন, প্রতি পদক্ষেপ পর্যন্ত রমেশের পরিচিত; অথচ, বহুদিনব্যস্ত স্মৃতির কবাত কোন-মতেই তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল না। আধঘণ্টা পরে পূজা সাবিয়া মেয়েটি আবার যখন বাহিরে আগিল, রমেশ আর একবার তাহার মুখ দেখিতে পাইল; কিন্তু তেমনই অপরিচয়ের দ্বর্ভেদ প্রাকারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। পথে চলিতে চলিতে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল,—“সঙ্গে আপনার আত্মীয় কেউ নেই?”—মেয়েটি উত্তর দিল,—“না। দাসী আছে, সে বাসায় কাজ করচে। আমি প্রায়ই এখানে আসি, সমস্ত চিনি।” “কিন্তু, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?” মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পথ চলিবার পরে বলিল,—“নইলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারি কষ্ট হ’ত। আমি রমা।”

\*

\*

\*

\*

সম্মুখে বসিয়া আহার করাইয়া, পান দিয়া বিশ্রামের জন্ত নিজের হাতে সতরঞ্চি পাতিয়া দিয়া, রমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সেই শব্দ্যর শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিয়া, রমেশের মনে হইল, তাহার এই তেইশবর্ষব্যাপী জীবনটা এই একটা বেলায় মধ্যে যেন আগা-গোড়া মদলাইয়া গেল। ছেলেকোলা হইতেই তাহার বিদেশে

পরশ্রমে কাটিয়াছে। খাণ্ডরাটার মধ্যে কুন্নিবৃত্তির অধিক আর কিছু যে কোনো অবস্থাতেই থাকিতে পারে, ইহা সে জানিতই না। তাই, আজকার এই অচিন্তনীয় পরিতৃপ্তির মধ্যে তাহার সমস্ত মন বিশ্বস্বে, মাধুর্য্যে, একেবারে ডুবিয়া গেল। রমা বিশেষ কিছুই এখানে তাহার আহারের স্তম্ভ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। নিত্যন্তই সাধারণ ভোজ্য ও পেষ দিয়া তাঁহাকে খাণ্ডরাইতে হইয়াছে। এই-স্বস্ত্য তাহার বড় ভাবনা ছিল, পাছে তাঁহার খাওয়া না হয় এবং পরের কাছে নিন্দা হয়। হায় রে পর! হায় রে তৎদের নিন্দা! খাওয়া না হইবার দুর্ভাবনা যে তাহার নিজেরই কত আপনার এবং সে যে তাহার অন্তরের অন্তরতম গহ্বর হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া, তাহার সর্ববিধ দ্বিধা-সঙ্কোচ সজোরে ছিনিয়া লইয়া, এই খাণ্ডরার দায়গার তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, এ কথা কেমন করিয়া অন্ধ সে তাহার নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিবে। আজ ত কোন লজ্জার বাধাই তাহাকে দূরে রাখিতে পারিল না। এই আহার্য্যের স্বস্ত্য-স্বস্তি শুধু বস্ত্র দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই সে স্রুগ্ধে আসিয়া বসিল। আহার নির্ঝিল্লি সমাধা হইয়া গেলে, গভীর পরিতৃপ্তির যে নিশ্বাসটুকু রমার নিজের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহা রমেশের নিজের চেয়ে যে কত বেশি, তাহা আর কেহ যদি না জানিল; যিনি সব জানেন, তাঁহার কাছে ত গোপন রহিল না।

দিবানিজ্জা রমেশের প্ৰত্যাস ছিল না। তাহার স্রুগ্ধের ছোট জানালায় বাহিরে নববর্ষার ধূসর-প্রাচল-মেঘে মধ্যাহ্ন-আকাশ ভরিয়া উঠিতেছিল; অর্দ্ধ-নিম্নলিত চক্ষে সে তাহাই দেখিতেছিল। তাহার আত্মীয়গণের আসা না আসার কথা আর তাহার মনেই ছিল না। হঠাৎ রমার মুহূর্ত্ত তাহার কানে গেল। সে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল,—“আজ বকস-বাড়ী বাওয়া হবে না, তখন এইখানেই থাকুন!” রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বসিল,—

“কিন্তু ধার বাড়ী, তাঁকে এখনো ত দেখতে পেলাম না। তিনি না বললে থাকি কি ক’রে?” রমা সেইখানে গাঁড়াইয়াই প্রত্যুত্তর করিল,—“তিনিই বলচেন থাকতে। এ বাড়ী আমার।” রমেশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল,—“এ স্থানে বাড়ী কেন?” রমা বলিল,—“এ স্থানটা আমার খুব ভাল লাগে। প্রায়ই এসে থাকি। এখন লোক নেই বটে; কিন্তু, এমন সময় হয় যে, পা-বাড়াবার জারগা থাকে না।” রমেশ কহিল, “বেশ ভাল, তেমন সুমর নাই এলে?” রমা নীরবে একটু হাসিল। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “তারকনাথ ঠাকুরের উপর, বোধ করি, তোমাদের খুব ভক্তি, না?” রমা বলিল,—“তেমন ভক্তি আর হয় কই? কিন্তু বহুদিন বেঁচে আছি, চেষ্টা করতে হবে ত।” রমেশ আর কোন প্রশ্ন করিল না। রমা সেইখানেই চৌকাঠ খেসিয়া বসিয়া পড়িয়া, অল্প কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল,—“রাত্রে আপনি কি খান?” রমেশ হাসিয়া কহিল, “যা” জ্বোটে, তাই খাই। আমার পেতে বসবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কখনো খাবার কথা মনে হয় না। তাই, বামুনঠাকুরের বিবেচনার উপরেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।” রমা কহিল,—“এত বৈরাগ্য কেন?” ইহা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোপ কিংবা সরল পরিহাস মাত্র, তাহা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না। সংক্ষেপে জবাব দিল,—“না। এ শুধু আলস্য।” “কিন্তু, পরের কাজে ত আপনার আলস্য দেখিনে?” রমেশ কহিল,—“তার কারণ আছে। পরের কাজে আলস্য করলে ভগবানের কাছে জবাবদিহিতে পড়তে হয়। নিজের কাজেও হয় ত হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই অত নর!” রমা একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল,—“আপনার টাকা আছে, তাই আপনি পরের কাজে মন দিতে পারেন; কিন্তু যাদের নেই?” রমেশ বলিল,—“তাদের কথা জানিনে রমা! কেন না, টাকা থাকারও কোন পরিমাণ নেই, মন দেবারও কোন ধরাবাঁধা ওজন নেই। টাকা থাকা না থাকার

তিসেব তিনিই জানেন, যিনি ইহ-পরকালের ভার নিয়েছেন।” রমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—“কিন্তু, পরকালের চিন্তা করবার বয়স ত আপনার হয় নি। আপনি আমার চেয়ে শুধু তিন বছরের বড়।” রমেশ হাসিয়া বলিল,—“তার মানে, তোমার আরও হয় নি। ভগবান্ তাই করুন, তুমি দীর্ঘজীবী হ’য়ে থাক ; কিন্তু, আমি নিজের সম্বন্ধে আজই যে আমার শেষ দিন নয়, এ কথা কখনও মনে করিনে।” তাহার কথার মধ্যে যেটুকু প্রসঙ্গ আসাত ছিল, তাহা বোধ করি, বুঝা হয় নাই। একটুখানি স্থির থাকিয়া রমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল,—“আপনাকে সংস্কার-মার্ফিক করতে ত দেখলুন না ! মন্দিরের মধ্যে কি আছে না আছে, তা’ না হয় নাই দেখলেন, কিন্তু খেতে ব’সে গণ্ডু কবটাও কি ভুলে গেছেন ?” রমেশ মনে মনে হাসিয়া বলিল,—“ভুলিনি বটে, কিন্তু ভুললেও কোন ক্ষতি বিবেচনা করিনে। কিন্তু, এ কথা কেন ?” রমা বলিল,—“পরকালের ভাবনাটা আপনার খুব বেশী কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।” রমেশ তাহার জবাব দিল না ; তাহার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত দুই জনে চুপ করিয়া রহিল। রমা আন্তে আন্তে বলিল,—“দেপুন, আমাদের দীর্ঘজীবী হ’তে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। আমাদের হিন্দুর ধরে বিধবার দীর্ঘজীবন কোন আত্মীয় কোন দিন কামনা করে না।” বলিয়া আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—“আমি মরবার জন্তে যে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তা, সত্যি নয় বটে, কিন্তু বেরীদিন বেঁচে থাকবার কথা মনে হ’লেও আমাদের ভয় হয়। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে ত সে কথা ধাটে না ! আপনাকে জোর ক’রে কোন কথা বলা আমার পক্ষে প্রগলভতা ; কিন্তু, সংসারে ঢুকে যখন পরের জন্তে মাথাব্যথা হওয়াটা নিজেরই নিতান্তই ছেলে-মাগুষি ব’লে মনে হবে, তখন আমারই এই কথাটি স্মরণ করবেন।” প্রত্যুত্তরে রমেশ শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে

রমার মতই ধীরে ধীরে বলিল,—“কিন্তু তোমাকে স্বয়ং ক’রে বলি, আজ আমার এ কথা কোন মতেই মনে হচ্ছে না। আমি তোমার ত কেউ নই রমা, বরং তোমাদের পাখের কাঁটা। তবু প্রতিবেশী ব’লে আজ তোমার কাছে যে বস্ত্র পেলুম, সংসারে ঢুকে এ বস্ত্র বারা আপনার লোকের কাছে নিত্য পায়, আমার ত মনে হয়, পরের ছঃখ-কষ্ট দেখলে তারা পাগল হয়ে ছোটে। এইমাত্র আমি একা ব’সে চুপ ক’রে ভাবছিলুম, আমার সমস্ত জীবনটি যেন তুমি এই একটা বেলায় মধ্যে আগাগোড়া বদলে দিয়েচ। এমন ক’রে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত বস্ত্র কোরে আমাকে কেউ কোন দিন খাওয়ায়নি। খাওয়ার মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছে থেকে এই প্রথম জানলাম রমা।” কথা শুনিয়া রমার সর্কাস কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু সে তৎক্ষণাত্ স্থির হইয়া বলিল,—“এ ভুলতে আপনার বেশী দিন লাগবে না। যদি বা একদিন মনেও পড়ে, অতি তুচ্ছ ব’লেই মনে পড়বে।”

রমেশ কোন উত্তর করিল না। রমা কহিল,—“দেশে গিয়ে যে, নিজে করবেন না, এই আমার ভাগ্য।” রমেশ আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—“না রমা, নিজে করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না। আজকের দিনটা আমার নিন্দা-সুখ্যাতিব বাহিরে!” রমা কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া, খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া, নিজেব ঘরে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেখানে নির্জন ঘরের মধ্যে তাহার দুইচোখ বহিয়া বড় বড় অশ্রু ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া করিয়া পড়িতে লাগিল।

দুইদিন অবিজ্ঞান বৃষ্টিপাত হইয়া অপরাহ্ন-বেলায় একটু ধরপ হইয়াছে। চতুর্মুখে গোপাল সরকারের ক্যাব্লে বসিয়া রমেশ



জমিদারীর হিসাবপত্র দেখিতেছিল ; অকস্মাতঃ প্রায় 'কুড়িজন কৃষক' আসিয়া কাদিয়া পড়িল—“ছোটবাবু, এ বাড়ী রকে করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধরে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে।” রমেশ অবাক হইয়া কহিল, “ব্যাপার কি ?” চাষারা কহিল, —“একশ-বিশের মাঠ ডুবে গেল, জল বা'র ক'রে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে বাবু, গায়ে একটা ঘরও খেতে পাবে না।” কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। গোপাল সরকার তাহাদের দুই একটা প্রশ্ন করিয়া, ব্যাপারটা রমেশকে বুঝাইয়া দিল। একশ-বিশার মাঠটাই এ গ্রামের একমাত্র ভরসা। সমস্ত চাষীদেরই কিছু কিছু জমি তাহাতে আছে। ইহার পূর্বাধারে সরকারী প্রকাণ্ড বাঁধ পশ্চিম ও উত্তরদ্বারে উচ্চ গ্রাম, শুধু দক্ষিণদ্বারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখ্যোদের। এই দিক দিয়া জল নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মত আছে। বৎসরে দু'শ টাকার মাহ বিক্রী হয় বলিয়া জমিদার বেগীবাবু তাহা কুড়া-পাহারার আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষারা আজ সকাল হইতে তাহাদের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া, এইমাত্র কাদিতে কাদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে। রমেশ আর শুনিবার জন্ত অপেক্ষা করিল না, রুতপদে প্রস্থান করিল। এ বাড়ীতে আসিয়া বথন প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা হয়। বেণী তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছেন এবং কাছে হালদার-মহাশয় বসিয়া আছেন ; বোধ করি, এই কথাই হইতেছিল। রমেশ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল,— “জলার বাঁধ আটকে রাখলে আর ত চলবে না, এখন সেটা কাটিয়ে দিতে হবে।” বেণী ছ'কাটা হালদারের হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, “কোন বাঁধটা ?” রমেশ উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল, ক্রুদ্ধভাবে কহিল,—“জলার বাঁধ আর কটা আছে বড়দা ? না কাটিলে সমস্ত পাইয়ের ধান হেলে যাবে। জল বা'র ক'রে দেবার ব্যবস্থা নাই।” বেণী কহিলেন,—“সেই সঙ্গে দু'তিনশ

টাকার মাহ্ বেরিয়ে যাবে, সে খবরটা রেখেচ কি ? এ টাকাটা দেবে কে ? চাষা, না তুমি ?” রমেশ রাগ সামলাইয়া বলিল—“চাষা গরিব ; তারা দিতে শু পারবেই না, আর আমিই বা কেন দেব, সে ত বুঝতে পারিনে ।” বেণী জবাব দিলেন,—“তা হ’লে আমরাই বা কেন এত লোকসান করতে যাব, সে ত আমিও বুঝতে পারিনে ।” হালদারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“খুড়ো, এমনি ক’রে তারা আমার জমিদারী রাখবেন । ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে পড়েই মড়াকারা কাঁদছিল । আমি সব জানি । তোমার সদরে কি দরওয়ান নেই ? তার পারের নাগরা-জুতো নেই ? বাও, ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা কর গে ; জল আপনি নিকেশ হ’য়ে যাবে ।” বলিয়া বেণী, হালদারের সহিত একবোগ হিঃ—হিঃ—করিয়া নিজের রসিকতার নিজে হাসিতে লাগিলেন । রমেশের আর সহ্য হইতেছিল না, তথাপি সে প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করিয়া বিনীতভাবে বলিল,—“ভেবে দেখুন বড়দা, আমাদের তিন ঘরের ছ’শ টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে । যেমন ক’রে হোক, পাঁচসাত হাজার টাকা তাদের ক্ষতি হবেই ।” বেণী হাতটা উলটাইয়া বলিলেন,—“হ’ল হ’লই । তাদের পাঁচহাজারই যাক, আর পঞ্চাশ হাজারই যাক, আমার গোটা সদরটা কোপালেও ত দুটো পয়সা বা’র হবে না, যে ও শালাদের জন্তে ছ’ছ’ টাকা উড়িয়ে দিতে হবে ?”

রমেশ শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, “এরা সারা বছর খাবে কি ?” যেন ভারি হাসির কথা । বেণী একবার এপাশ, একবার ওপাশ হেলিয়া-গুলিয়া মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া, খুখু কেলিয়া, শেষে স্থির হইয়া কহিলেন—“খাবে কি ? দেখবে, ব্যাটারা যে বার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে । তারা, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা ক’রে চল, কর্তারা এমনি করেই বাড়িরে গুলিয়ে এই যে এক-আধ টুকরা উজ্জিষ্ট ফেল’ রেখে গেছেন, এই আমাদের

নেড়ে-চেড়ে শুদ্ধিগে গাছিয়ে ধেরেদেরে, আবার ছেলেদের জন্তে রেখে যেতে হবে। ওরা থাকবে কি? খারবজ্জ ক'রে থাকবে। নইলে আর কসটাদের ছোটলোক বলেছে কেন?" স্বপ্নার, লজ্জার, ক্রোধে, কোত্তে রমেশের চোখ-মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু, কণ্ঠ-স্বর শান্ত রাখিয়াই বলিল,—“আপনি যখন কিছুই করবেন না ব'লে স্থির করেছেন, তখন এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই। আমি রমার কাছে চল্লম, তার মত হ'লে আপনার একার অমতে কিছুই হবে না।”

বেণীর মুখ গভীর হইল; বলিলেন,—“বেশ, গিয়ে দেখ গে, তার আমার মত ভিন্ন নয়। সে সোজা মেয়ে নয় তারা,—তাকে ভোলানো সহজ নয়। আর তুমি, ত ছেলে-মানুষ, তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে ক'রে তবে ছেড়েছিল! কি বল খুড়ো?” খুড়ার মতামতের জন্ত রমেশের কোতুল ছিল না; বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; সে নিরুত্তরে বাহির হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে তুলসীমূলে সন্ধ্যার প্রদীপ দিয়া প্রণাম সাজ করিয়া রমা মুখ তুলিয়াই বিশ্বমে অবাক হইয়া গেল। ঠিক সন্মুখে রমেশ দাঁড়াইয়া। তাহার মাথার আঁচল গলার জড়ানো। ঠিক যেন সে এইমাত্র রমেশকেই নমস্কার করিয়া মুখ তুলিল। ক্রোধের উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় মাসার সেই প্রথম দিনের নিষেধবাক্য রমেশের স্মরণ ছিল না; তাই সে সোজা ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং রমাকে তদবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল; দু-জনের মাসখানেক পরে দেখা।

রমেশ কহিল,—“তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত শুনেচ। জল বা'র ক'রে দেবার জন্তে তোমার মত দিতে এসেচি।” রমার বিষয়ের তাব কাটিয়া গেলে, সে বাথার আঁচল তুলিয়া দিয়া কহিল,—“সে কেমন ক'রে হবে? তা হাঁকা বড়দার মত মেই।” “নেই আনি। তাঁর

একলার ভয়তে কিছুই আসে যায় না।” রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল,—“জল বা’র করে দেওয়া উচিত বটে ; কিন্তু, মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত করবেন ?” রমেশ কহিল,—“অত জলে কোন বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ বছর সে টাকাটা আমাদের ক্ষতি স্বীকার কর্তেই হবে। না হ’লে গ্রাম মারা যায়।” রমা চুপ করিয়া রহিল। রমেশ কহিল,—“তা হ’লে অনুমতি দিলে ?” রমা মৃদুকণ্ঠে কহিল,—“না। অত টাকা আমি লোকসান কর্তে পারব না।” রমেশ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কিছুতেই এরূপ উত্তর আশা করে নাই। বরং কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহার একান্ত অসুখোদ রমা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। রমা মুখ না তুলিয়াই, বোধ করি, রমেশের অবস্থাটা অসুখব করিল। কহিল,—“তা’ ছাড়া, বিষয় আমার তাইয়ের, আমি অভিভাবক মাত্র।” রমেশ কহিল, “না, অর্ধেক তোমার।”

রমা বলিল,—“শুধু নামে। বাবা নিশ্চয় জানতেন, সমস্ত বিষয় বতীনই পাবে ; তাই অর্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।” তথাপি রমেশ মিনতির কণ্ঠে কহিল,—“রমা, এ ক’টা টাকা ? তোমাদের অবস্থা এ দিকের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়, আমি মিনতি জানাচ্ছি, রমা, এর জন্তে এত লোকের অন্নকষ্ট ক’রে দিয়ে না। যথার্থ বলছি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হ’তে পার, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।”

রমা তেমনি মৃদুভাবেই জবাব দিল,—“নিজের ক্ষতি কর্তে পারিনে ব’লে যদি নিষ্ঠুর হই, না হয় তাই। ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই না হয় ক্ষতিপূরণ ক’রে দিন না।” তাহার মৃদু কণ্ঠস্বরে বিজ্ঞপ কল্পনা করিয়া রমেশ জলিয়া উঠিল। কহিল,—“রমা, মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সূক্ষ্মাৰ্কে। এই জায়গাটার না কি কাকি চলে না, তাই, এইখানেই মানুষের

যথার্থ রূপ প্রকাশ পেরে উঠে। তোমারও আজ তাই পেলো, কিন্তু, তোমাকে আমি কখনো এমন ক’রে ভাবিনি। চিয়কাল ভেবেচি, তুমি এর চেয়ে অনেক—অনেক উচুতে; কিন্তু, তুমি তা’ নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি অতি নীচ—অতি ছোটো।” অসহ বিশ্বসে রমা ছই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল,—“কি আমি?”

রমেশ কহিল,—“তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হ’য়ে উঠেছি, সে তুমি টের পেরেচ ব’লেই আমার কাছে ক্ষতিপূরণেব দাবী করলে! কিন্তু, বড়দাও মুখ ফুটে এ কথা বলতে পারেন নি; পুরুষমানুষ হ’য়ে তাঁর মুখে বা’ বেধেচে, স্ত্রীলোক হ’য়ে তোমার মুখে তা’ বাধেনি। আমি এর চেয়েও বেশি-ক্ষতিপূরণ করতে পারি; কিন্তু, একটা কথা আজ তোমাকে ব’লে যাই, রমা, সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার উপর জ্বলুম করাটা, সব চেয়ে বেশি। আজ তুমি তাই ক’রে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেচ।” রমা বিস্ময়, হত-বুদ্ধির ভ্রায় ফাল্-ফাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল—একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। রমেশ তেমনি শান্ত, তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—“আমার দুর্বলতা কোথায়, সে তোমার অগোচর নেই বটে, কিন্তু, সেখানে পাক দিয়ে আর এক বিন্দু রস পাবে না, তা’ ব’লে দিয়ে যাচ্ছি। আমি কি করব, তাও এইসঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখন জোর ক’রে বাঁধ কাটিয়ে দেব—তোমরা পার আটকাবার চেষ্টা কর গে।” বলিয়া রমেশ চলিয়া যায় দেখিয়া রমা ফিরিয়া ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া রমেশ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে রমা কহিল,—“আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকে বত অপমান করলেন, আমি তার একটারও জবাব দিতে চাইনে; কিন্তু, এ কাজ আগনি কিছুতেই করবার চেষ্টা করবেন না।” রমেশ প্রশ্ন করিল,—“কেন?” রমা কহিল,—“কারণ, এজ

অগম্যমানের পবেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছা করে না।" তাহার মুখ যে কিরূপ অস্বাভাবিক পাণ্ডুব হইয়া গিয়াছিল এবং কথা কহিতে ঠোঁট কাঁপিয়া গেল, তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও রমেশ লক্ষ্য করিতে পারিল। কিন্তু, মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি তাহার ছিল না;—তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—“কলহ-বিবাদের অভিকর্ষ আমারও নেই বটে, কিন্তু, তোমার সন্তাভের মূল্যও আর আশ্রয় কাছে কিছুমান নেই। যাই হোক, বাগ্‌বিত্ততার আবদ্ধক নেই, আমি চলুম।” দাসী উপরে তাকুরবার আবদ্ধ থাকায় এমনকণের কিছুই জানিতে পারেন নাই। নীচে আসিয়া দেখিলেন, বস্মা দাসীকে সঙ্গে নইয়া বাহির হইতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—“এই জন-কাদার সন্তাভ পর কোথায় দাস রম্য?”

“একবার বড়দার গুহানে যাব খাসি।”

দাসী কহিল,—“পথে আর এতটুকু কাটা পাবার ঘো নেই দিদিমা। ছোটবাবু এম্মান রাত্তা বাঁধয়ে দিরেছেন যে, সিঁদুর পালনে বাড়িয়ে নেওয়া যায়। ভগবান্ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, গরীব দুঃখ সাপের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেছে।”

তখন রাবি বোধ করি এগারট। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকদূর দোকানের চাপাগলার আগুয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ এককটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর অশ্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে সেস দিয়া একজন ক্রীন্দণাকৃতি প্রৌঢ় মুল্যমান চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—পরণের বস্ত্র রক্তে রাঙা; কিন্তু, সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা-গলার অনুনয় কবিতোছে,—“কথা শোনু আকবর খানার চল। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি, ত বাঁধালবংশের ছেলে নই আমি।” শিহনে চাহিয়া কহিল,—“রমা, তুমি একবার বল না, চুপ ক’রে রইলে

কেমন ?” কিন্তু, রমা তেমনি কাঠের মত বসিয়া রহিল। আকবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল,—“সাবাস! হাঁ,—মাগের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটবাবু! লাঠি ধরলে বটে!” বেনী ব্যস্ত এবং জুঁক হইয়া কহিল,—“সেই কথা বলতেই ত বল্টি আকবর! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? সেই ছোড়ার, না তার সেই হিন্দুস্থানী চাকরটার?” আকবরের গুষ্ঠপ্রান্তে ইহা হাসি প্রকাশ পাইল। কহিল,—“সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার? সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়বাবু? কি বলিস্ রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?” আকবরের দুই ছেলেই অদূরে কুড়সড় হইয়া বসিয়াছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল, “আমার হাতের চোট গলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই ‘বাপ-করে’ বসে পড়ল, বড়বাবু!” রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের পিরগুরের প্রজা। সাবেক দিনে লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পরে ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া, বাঁধ পাহারা দিবায় জড় লাঠিইয়া দিয়াছিল, এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে! সে নিজেই যে কত বড় লাঠিয়াল, এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল,—“তখন ছোট বাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক ক’রে দাঁড়াল দিদি-ঠাকুরাণ, তিন ব্যাপ-ব্যাটার মোরা হটাতে নারলান। আঁধারে বাধের মত তেনার চোখ জ্বল্টি লাগল। কহিলেন, আকবর, বুড়োমাছুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারাগায়ের লোক মারা পড়বে, তাই কাটতেই হবে। তোর আপনায় গায়ের ও ত জমিজমা আছে, সম্মুখে দেখ রে, সব বরবাদ হ’য়ে গেলে তোর

ক্যামন লাগে ?” মুই সেলাম ক’রে কইলাম, “আলার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। জোমার আড়ালে দেড়িরে ঐ-বে ক’ সম্মুখি হুয়ে কাপড় জড়িয়ে অপারপ্ কোদাল মারচে, এদের মুখ ক’টা ফাঁক ক’রে দিয়ে যাই।” বেণী রাগ সামলাইতে না পারিয়া কথার মাকথানেই চোঁচাইয়া কহিল,—“বেইমান ব্যাটারা—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে ঢালাকি মারা হ’ছে—”

জাণারা তিন দাপবেটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল,—“খবরদার বড়বাবু, বেইমান কোমো না; মোরা মোছলমানের ছ্যাণে, সব নইতে পারি,—ও পারি না।” কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া খেলিয়া রমাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল,—“আরে বেইমান কর দিদি? ঘরের মাথা ঘসে বেইমান কইচ, বড়বাবু, চোখে দেখলে জান্তি পারতে ছোটবাবু কি! বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—“ছোটবাবু কি! তাই খানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বলবি, তুই বাব পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হ’য়ে তোরে মেরেচে।” আকবর জিত্ কানিয়া বলিল,—“তোবা তোবা, দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু?” বেণী কহিল, “না হয় আর কিছু বলবি। আজ গিয়ে প্রথম দেখিয়ে আয় না—কাল ওয়ারেন্ট বা’র ক’বে একেবারে হাজতে পূর্ব। রমা, তুমি ভাল ক’রে আর একবার বুঝিয়ে বল না।—এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।” রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—“না দিদি ঠাকুরাণ, ও পারব না।” বেণী ধমক দিয়া কহিল,—“পারনি কে ন?” এবার আকবরও চোঁচাইয়া কহিল,—“কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দার কর না? দিদিঠাকুরাণ, তুমি লুকুম করলে আসামী হ’য়ে জাল খাটতি পারি, ফেরিদি হব কোন্ কালামুখে?” রমা মুহূর্তকণ্ঠে একবারমাত্র কহিল,—“পারবে না আকবর?” আকবর



সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—“না দিদিঠাকুবাণ, আর সব খাতি, সদবে গিয়ে গায়েব চোট দেখাতে না পাবি।—ওঠে গহর, এই গাব সবকে যাই। মোরা নানিশ কবতি পাব্ব না।” বলিয়া তাহাবা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেশী ক্রুদ্ধ নিবাসীর তাহাদের দিকে চাতিয়া ছুটে চোখে অগ্নি-বর্ষণ করিয়া মন মনে অকথা গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং বমাব একান্ত নিকণ্ডম স্তব্ধতাব কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ইথেব আশুণে পুড়িতে লাগিল। সমস্ত প্রকাণ্ড অশ্বিনয় বিনয়, তৎসন। ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আকবব আনি ছেলেদেব হইয়া যখন বিদায় হইয়া গেল, তখন বন্য বুক চিবিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল, অকাবণে তাহাব হৃৎকম্প অশ্রু প্রাণিত হইয়া উঠিল, এবং আশ্রিত্য এতবড় অপমান তাহাব সম্পূর্ণ পবাজিত গৌনফল হওয়া ন হও কেন যে বেবলি মনে হইতে লাগিল, তাহাব বুকব উপর হইতে একটা অতি শুভ্রতাব পাষণ নামিয়া গেল, তাহাব কোন হেতুই সে ভিজিয়া পাহল না। সারারাজি তাহাব ঘুম হইল না, সেট যে তাবদেখবে স্নমুখে বসিয়া খাওরাইয়া-ছিন্ন নিশ্চয়ব গাশ্চি চোখেব উপর ভাসিয়া বেড়াতে লাগিল; এবং সন্ধ্যা মনে হইতে লাগিল, সেটী অন্ধব সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজ কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়াছিল, ততহ তাহাব চোখেব লগে সমস্ত মুখ ভাসিয়া সাইতে লাগিল।

ছেলেবেলাস একদিন বমেশ রমাকে ভাল বাসিয়াছিল। নিত্যন্ত ছেলেমানুষি ভালোবাসা, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে বে কত গভীর, তাহা তারকেশ্বরে সে প্রথম অনুভব করিতে পারিয়াছিল। এবং আরও কত গভীর, সেইদিন সব চেয়ে বেশী টের পাইয়াছিল, যে দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রমার সমস্ত সমস্ত

সে একেবারে ভূমিস্বামী করিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তৎপরে সেই নিদাক্ষণ রাত্রির ঘটনার পর হইতে রমার দিক্টাই একেবারে রমেশের কাছে মহামরুর ছায় শূন্য ধুৎ করিতেছিল। কিন্তু, সে যে তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম, শোয়া-বসা, এমন কি চিন্তা, অধারন পর্যন্ত এমন বিষাদ করিয়া দিবে, তাহা রমেশ বরনাও করে নাই। তাহাতে গৃহ-বিচ্ছেদ এবং সর্বব্যাপী অস্বাভাবিকতা পোণ যখন তাহার এক মুহূর্ত্তের আর প্রাণের মধ্যে তিষ্ঠিতে চাহিতেছিল না, তখন নিম্নলিখিত ঘটনার সে আর একবার সোজা হইয়া বসিল।

খালের ওপারে পিরপুর গ্রাম তাহাদেরই জমিদারী। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া, রমেশের কাছে উপস্থিত হইল; এই বলিয়া নালিশ জানাইল যে, যদিও তাহারা তাঁহাদেরই প্রজা, অথচ তাহাদের ছেলেরা ছেলেরা মুসলমান বলিয়া গ্রামের সুলে ভক্তি হইতে দেওয়া হয় না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া তাহারা বিবেচনামূলক হইয়াছে, মাটির মহাশয়রা কোন মতেই তাহাদের ভেদেদের গ্রহণ করেন না। রমেশ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বাহিল—“এমন অস্বাভাবিকতা আরও কখনও শুনি নাই? তোমাদের ছেলেরা আজই লইয়া আইস; আমি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভক্তি করিয়া দিব।” তাহারা কহিল,—“যদিও, তাহারা প্রজা বটে, কিন্তু ধাক্কা দিয়াই জমি ভোগ করে। সে জন্ত হিংস্র মত জামদারকে তাহারা ভয় করে না; কিন্তু, এক্ষেত্রে বিবাদ করিয়াও লাভ নাই। কারণ ইহাতে বিবাদই হইবে, বণার্থ উপকার কিছুই হইবে না। বরঞ্চ, তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা ছোট রকমের ইচ্ছা কনিত্তে ইচ্ছা করে, এবং ছোটবাবু একটু সহ্য করিলেই হয়।” কলহ বিবাদে রমেশ নিজেও ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাকে আর বাড়িয়া না-ভুলিয়া, ইহাদের পরামর্শ স্বযুক্তি বিবেচনা করিয়া, সার দিল এবং তখন হইতে এই নুতন বিপাক-প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যাপৃত হইল। ইহাদের দলপর্কে

আসিয়া রমেশ শুধু যে নিজেকে হুঁহু বোধ করিল, তাহা নহে, এই একটা বৎসর ধরিয়া তাহার যত বলক্ষণ হইয়াছিল, তাহা দীর্ঘে দীর্ঘে যেন ভরিয়া আসিতে লাগিল। রমেশ দেখিল, কুঁয়াপুরের হিন্দু প্রতিবেশীর মত ইহারা প্রেতি-কথার বিবাদ করে না; করিলেও তাহারা প্রেতিহাত এক নম্বর রুকু করিয়া দিবার জন্ত সদরে ছুটিয়া যায় না। বরঞ্চ মুকুন্দিদের বিচারফলই, সম্ভ্রষ্ট অসম্ভ্রষ্ট যে ভাবেই হোক, গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্যার্থে একরূপ সর্বাস্তঃকরণে আগ্রসর হইয়া আসিতে, রমেশ ভদ্র, অভদ্র, কোন হিন্দু গ্রামবাসীকেই দেখে নাই।

একে ত জাতিভেদের উপর রমেশের কোনদিনই আস্থা ছিল না, তাহাতে এই দুই গ্রামের অবস্থা পাশাপাশি তুলনা করিয়া তাহার অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে স্থির করিল, হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক অসমতাই এই হিংসাঘেযের কারণ। অথচ, মূললমানমাত্রই ধর্মসম্বন্ধে পরস্পর সমান, তাই একতার বন্ধন ইহাদের মত হিন্দুদের নাই এবং হইতেও পারে না। আর জাতিভেদ নিবারণ করিবার কোন উপায় যখন নাই, এমন কি, ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও যখন পল্লী-গ্রামে একরূপ অসম্ভব, তখন কলহবিবাদের লাগব করিয়া সখ্য ও শ্রীতি সংস্থাপনে প্রয়াস করাই পণ্ডিত্রম। সুতরাং এই কয়টা বৎসর ধরিয়া সে নিজের গ্রামের জন্ত যে বৃথা চেষ্টা করিয়া মরিয়াছিল, সে জন্ত তাহার অত্যন্ত অনুশোচনা বোধ হইতে লাগিল। তাহার নিষ্কর প্রতীতি হইল, ইহারা এমনি ষাওয়া-খাওয়া করিয়াই চিরদিন কাটিইয়াছে, এবং, এমনি করিয়াই চিরদিন কাটিইতে বাধ্য। ইহাদের ভালো কোন দিন কোনমতেই হইতে পারে না! কিন্তু, কথাটা পাক্য করিয়া লওয়া ত চাই। নানা কারণে অনেক দিন হইতে তাহার জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। সেই মারামারির পর হইতে কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সে

সেদিকে যায় নাই। আন্ধ ভোরে উঠিয়া সে একেবারে তাঁর  
বরের দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যাঠাইমার বুদ্ধি ও  
অভিজ্ঞতার উপর তাহার এমন বিশ্বাস ছিল যে, সে কথা তিনি  
নিজেও জানিতেন না। রমেশ একটুখানি আশ্চর্য্য হইয়াই দেখিল,  
জ্যাঠাইমা এত প্রত্যাহেই স্থান করিয়া প্রস্তুত হইয়া সেই অস্পষ্ট  
আলোকে বরের মেয়ের বসিয়া, চোখে চস্মা আঁটিয়া, একখানি  
বই পড়িতেছেন। তিনিও বিস্মিত কম হইলেন না। বইখানি  
বন্ধ করিয়া তাহাকে আদর করিয়া ঘরে ডাকিয়া বসাইলেন এবং  
মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এত সকালেই যে রে?”  
রমেশ কহিল,—“অনেক দিন তোমাকে দেখতে পাইনি  
জ্যাঠাইমা। আমি পিরপুরে একটা স্কুল কর্চি।” বিধেপত্নী  
বালিলেন,—“ওনেচি। কিন্তু, আমাদের ইস্কুলে আর পড়াতে  
যাসনে কেন ব’ল’?” রমেশ কহিল,—“সেই কথাই বলতে  
এসেচি জ্যাঠাইমা! এদের মঙ্গলের চেষ্টা করা শুধু পণ্ডশ্রম। যারা  
কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, অভিমান অহঙ্কার বাদের এত  
বেশী, তাদের মধ্যে খেটে মরায় লাভ কিছুই নেই, শুধু, মাঝথেকে  
নিজেরই শত্রু বেড়ে উঠে। বরং, বাদের মঙ্গলের চেষ্টার সত্যকাণ্ড  
মঙ্গল হবে, আমি সেখানেই পরিশ্রম করব।” জ্যাঠাইমা কহিলেন,  
—“একথা ত নতুন নয় রমেশ! পৃথিবীতে ভাল করবার ভার যে  
কেউ নিজের ওপর নিরেচে, চিরদিনই তার শত্রু সংখ্যা বেড়ে  
উঠেছে। সেই ভবে যারা পেছিয়ে দাঁড়ায়, তুইও তাহাদের দলে  
গিয়ে যদি মিশিস্, তা হ’লে ত চলবে না বাবা! এ গুরুভার ভগবান  
তোকেই বইতে দিয়েছেন, তোকেই ব’য়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু  
হাঁবে, রমেশ, তুই নাকি ওদের হাতে জল খাস্?” রমেশ হাসিয়া  
কহিল,—“এই তাথ জ্যাঠাইমা, এর মধ্যেই তোমার কাণে উঠেছে।  
এখনো খাইনি বটে, কিন্তু, খেতে ত আমি কোন দোষ দেখিনে।  
আমি তোমাদের জাতিভেদ মানিনে।” জ্যাঠাইমা আশ্চর্য্য হইয়া

প্রশ্ন করিলেন;—“মানিস্নে কিরে? এ কি মিছে কথা, না, জাতিভেদ নেই যে, তুই মান্বিনে?” রমেশ কহিল,—“ঠিক ওই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে আজ তোমার কাছে এসেছিলাম জ্যাঠাইমা! জাতিভেদ আছে, তা’ মানি, কিন্তু একে ভাল ব’লে মানিনে?” “কেন?”

রমেশ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল,—“কেন, সে কি তোমাকে বলতে হবে? এর থেকেই যত মনোনাগিঞ্জ, যত বাদাবাদি, এ কি তোমার জানা নেই? সমাজে যাকে ছোটজাত ক’রে রাখা হয়েছে, সে যে বড়কে হিংসে করবে, এই ছোট হয়ে থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক’রে এর থেকে মুক্ত হ’তে চাইবে, সে ত খুব স্বাভাবিক। হিন্দুরা সংগ্রহ করতে চায় না, জানে না—জানে শুধু অপচয় করতে। নিজেকে এবং নিজের জাতকে রক্ষা করার এবং বাড়িয়ে তোলবার যে একটা সংসারিক নিয়ম আছে, আমরা তাকে স্বীকার করি না বলেই প্রতিদিন ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছি। এই যে মাগুষ-গণনা করার একটা নিয়ম আছে, তার ফলফলটা যদি পড়ে দেখতে জ্যাঠাইমা, তা হ’লে ভয় পেয়ে নেবে! মাগুষকে ছোট ক’রে অপমান করবার ফল হাতে হাতে টেব পেতে! দেখতে পেতে, কেমন ক’রে হিন্দুরা প্রতিদিন কমে আসছে, এবং মুসল-মানেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠছে। তবুত হিন্দুর হুঁস হয় না!” বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন,—“তোমার এত কথা শুনে এখনো ত আমাব হুঁস হচ্ছে না রমেশ! যারা তাদের মাগুষ গুণ বেড়ায়, তারা যদি গুণে বলতে পারে, এতগুলো ছোটজাত শুধুমাত্র ছোট থাকবার ভয়েই জাত দিয়েচে, তা হ’লে হয়ত আমার হুঁস হ’তেও পারে। হিন্দু যে কমে আসছে, সে কথা মানি;—কিন্তু, তার অন্য কারণ আছে। সেটাও সমাজের ত্রুটি নিশ্চয়; কিন্তু ছোট-জাতের জাত দেওয়ারদেওয়ি তার কারণ নয়। শুধু ছোট ব’লে কোন হিন্দুই কোন দিন জাত দেয় না।”

রমেশ সন্দ্বিধকষ্টে কহিল,—“কিন্তু, পণ্ডিতেরা তাহা ত অস্বাভাবিক করেন জ্যাঠাইমা।” জ্যাঠাইমা বলিলেন,—“অস্বাভাবিক বলিলে ত তর্ক চলে না বাবা! কেউ যদি এমন খবর দিতে পারেন, অরুণ গায়ের এতগুলো ছোটজাত এই জন্তেই এ বৎসর জাত দিয়েচে, তা হ'লেও না হয় পণ্ডিতদের কথার কাণ দিতে পারি। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, এ সংবাদ কেউ দিতে পারবে না।” রমেশ তথাপি তর্ক করিয়া কহিল,—“কিন্তু, যারা ছোটজাত, তারা যে অত্যন্ত বড়জাতকে হিংসা করে চলবে, এতো আমার কাছে ঠিক কথা ব'লেই মনে হয় জ্যাঠাইমা।” রমেশের তাঁর উদ্বেজিত কথার বিশেষরূপী আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—“ঠিক কথা নয়, বাবা, একটুও ঠিক কথা নয়। এ তাদের সহর নয়। পাড়াগায়ে জাত ছোট কি বড়, সে জন্তে কারো এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। ছোট ভাই যেমন ছোট ব'লে বড়জাতকে হিংসা করে না, তু'এক বছর পরে ধন্যবার জন্তে যেমন তার মনে এতটুকুও ক্ষোভ নেই, পাড়াগায়েও ঠিক তেমনি। এখানে কারোও, বায়ন তরুণি ব'লে একটুও দুঃখ করে না, কৈবর্তের কারোও সমান চব্বার জন্তে একটুও চেষ্টা করে না। বড়জাতকে একটা প্রণাম করতে ছোটভায়েও যেমন লজ্জার মাথা কাটা যায় না, তেমনি কারোও বায়নের একটুখানি পায়ের ধুলো নিতে এতটুকু ব্যস্তিত হয় না। সে নয় বাবা, জাতিভেদটের হিংসে-দ্বেষ্টার হেতুই নয়। আস্ততঃ বাঙালীর যা' মেরুদণ্ড—সেই পল্লীগ্রামে নয়।” রমেশ মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—“তবে কেন এমন হয় জ্যাঠাইমা? ওগাঁয়ে ত এত সব মুসলমান আছে, তাদের মধ্যে ত এমন বিবাদ নেই। একজন আর একজনকে বিপদের দিনে এমন করে ত চেপে ধরে না। সেদিন অর্থাভাবে ঘরিক ঠাকুরের প্রার্থিত হ'লি ব'লে, কেউ তার মৃতদেহটাকে ছুঁতে পর্যন্ত চায়নি, সে ত ভূমি জ্ঞান।” বিশেষরূপী কহিলেন,—

“জানি বাবা, সব জানি। কিন্তু, জাতিভেদ তার কারণ নয়। কারণ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এখনো সত্যকাব একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা নেই। যাকে ষথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েছে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।” রমেশ হতাশভাবে একটা নিখাস ফেলিয়া কহিল,—  
 “এর কি প্রতীকারের কোন উপায় নেই জ্যাঠাইমা?” বিবেকশ্রী বলিলেন,—“আছে বই কি বাবা! প্রতীকার শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েছিস, শুধু সেই পথে। তাই ত তাকে কেবলি বাঁল, তুই তোর এই জন্মভূমিকে কিছুতে ছেড়ে যাসনে।” প্রত্যুত্তরে রমেশ কি একটা বগিতে ঝাইতেছিল। বিবেকশ্রী বাধা দিয়া বলিলেন,—“তুই বল্দি, মুসলমানদের মধ্যেও ত অজ্ঞান অত্যন্ত বেশী। কিন্তু, তাদের সঙ্কীর্ণ ধর্মই তাদের সব দিকে শুধরে রেখেছে। একটা কথা বলি রমেশ, পীরগাঁয়ে খবর নিলে শুনতে পাবি, জাকির ব’লে একটা বড়লোককে তারা সবাই ‘একঘরে’ ক’রে রেখেছে, সে, তার বিধবা সৎমাকে খেতে দেয় না ব’লে। কিন্তু, আমাদের এই গোবিন্দ গায়ুলী সে দিন তার বিধবা বড়ভাজকে নিজের হাতে ঘেরে আধমরা ক’রে দিলে, কিন্তু, সমাজ থেকে তার শাস্তি হওয়া চুলোয় যাক, সে নিজেই একটা সমাজের মাথা হ’য়ে ব’সে আছে। এ সব অপরাধ আমাদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত পাপপুণ্য; এর সাজা ভগবান ইচ্ছা হয় দেবেন, না হয় না দেবেন, কি পল্লী-সমাজ তাতে জ্রূপেক করে না।”

এই নূতন তথ্য শুনিয়া একদিকে রমেশ যেমন অবাক হইয়া গেল, অপরদিকে তাহার মন ইহাকেই হির-সত্য্য বাগধা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতে লাগিল। বিবেকশ্রী তাহা যেন বুঝিয়াই বলিলেন,—“ফলটাকেই উপায় ব’লে ভুল করিসনে বাবা। যে জন্তে তোর মন থেকে সংশয় ঘুচতে চাইচে না,—সেই জাতের।”

ছোটবড় নিয়ে মারামারি করাটা উন্নতির একটা লক্ষণ,—কারণ নয় রমেশ। সেটা সকলের আগে না হ'লেই নয়, মনে ক'রে যদি তাকে নিয়েই নাজাচাড়া করতে যাস, এদিক-ওদিক হু'দিক নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা সত্যি কি না, যাচাই করতে চাস, রমেশ, সতরের কাছাকাছি ছ'চারখানা গ্রাম খুরে এসে, তাদের সঙ্গে তোর এই ঝুঁয়াপুরকে মিলিয়ে দেখিস। আপনি টেব পাৰি।” কলিকাতার আঁত নিকটবর্তী একখানা গ্রামের সন্তিত রমেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহারই মোটামুটি চেহারাটা সে মনে মনে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই, অকস্মাৎ তাহার চোখের উপর হইতে যেন একটা কালো পদ্মা উঠিয়া গেল; এবং গভীর সম্মত ও বিশ্বসে চূপ করিয়া সে বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া রাহিল। তিনি কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিজের পূর্বানুভূতিক্রমে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—“তাই ত তোকে বার বার বলি, বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ ক'রে যাসনে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হ'তে পেরেচে, তাবা যদি তোর মতই গ্রামে ফিরে আস্ত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চ'লে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন ছরবছর হ'তে পারত না। তারা কখনই গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে মাথায় তুলে নিয়ে তোকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না।” রমেশের রমায় কথা মনে পড়িল। তাই আবার অভিমানের স্বরে কহিল,—“দূরে ম'রে বেতে আমারও আর হু'খ নেই জ্যাঠাইমা।” বিশ্বেশ্বরী এই স্বরটা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু, হতু বুঝিলেন না। কহিলেন,—“না, রমেশ, সে কিছুতেই হ'তে পারবে না। যদি এসেচিস, যদি কাজ সুর করেচিস, মাঝপথে ছেড়ে দিলে তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা ক'বে না।” “কেন জ্যাঠাইমা, জন্মভূমি শুধু ত আমার একার নয়?” জ্যাঠাইমা উদ্বীণ হইয়া বলিলেন,—“তোমার একার বই কি বাবা, শুধু তোমারই মা। দেখতে পাসনে, মা মুখ মুটে সন্তানের কাছে কোনদিনই কিছু দাবি করেন নি।



তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পৌছতে পারে নি, কিন্তু তুই, আম্বামাত্রই শুনতে পেয়েছিলি।” রমেশ আর তর্ক করিল না। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া, নিঃশব্দে প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্তরে, বিবেচনার পায়ের ধূলা মাখায় লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ভক্তি, করুণা ও কর্তব্যের একান্ত-নিষ্ঠার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া রমেশ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তখন সবোত্তম সূর্যোদয় হইয়াছে। তাহার ঘরের পূর্বদিকের মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে স্তব্ধ আকাশের পানে চাহিয়াছিল, সহসা শিশুকণ্ঠের আহ্বানে সে চমকিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, রমার ছোটতাই বতীন ঘরের বাহরে দাঁড়াইয়া লজ্জার আরক্তমুখে ডাকিতেছে,— “ছোড়দা” !—” রমেশ কাছে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— “কাকে ডাক্চ বতীন ?” “আপনাকে।”

“আমাকে ? আমাকে ছোড়দা” বলতে তোমাকে কে বলে দিলে ?”

“দিদি।”

“দিদি ? তিনি কি কিছু বলতে তোমাকে পাঠিয়েছেন ?” বতীন মাথা নাড়িয়া কহিল,— “কিছু না। দিদি বললেন, ‘আমাকে সঙ্গে ক’রে তোর ছোড়দা’র বাড়ীতে নিয়ে চল,—ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।’—বলিয়া সে দরজার দিকে চাহিল। রমেশ বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দেখিল, রমা একটা খামের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। সরিয়া আসিয়া সবিনয়ে কহিল,— “আজ আমার এ কি সৌভাগ্য ! কিন্তু, আমাকে ডেকে না পারিয়ে, নিজে কষ্ট ক’রে এলে কেন ? এসো, ঘরে এস।” রমা একবার ইতস্ততঃ করিল, তার পর বতীনের হাত ধরিয়া রমেশের অন্তঃসরণ করিয়া তাহার ঘরের চোকাঠের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল,— “আজ একটা জিনিষ ভিঞ্চে চাইতে আপনার বাড়ীতেই

এসেচি,—বলুন দেবেন ?” বলিয়া সে রমেশের মুখের পানে হিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই চাহনিতে রমেশের পরিপূর্ণ হৃদয়ের সপ্তস্বর অকস্মাৎ বেন উদ্গাদ-শব্দে বাজিয়া উঠিয়া একেবারে তাজিয়া ধরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্বেই তাহার মনের মধ্যে যে সকল সঙ্কর, আশা ও আকাঙ্ক্ষা অপরূপ দীপ্তিতে নাচিয়া ফিরিতে-ছিল, সমস্তই একেবারে নিবিয়া অন্ধকার হইয়া গেল। তথাপি প্রশ্ন করিল,—“কি চাই বল ?” তাহার অস্বাভাবিক শুষ্কতা রমার দৃষ্টি এড়াইল না। সে ভেমনি মুখের প্রতি চোখ রাখিয়া করিল,—“আগে কথা দিন।” রমেশ কণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল,—“তা’ পারিনে। তোমাকে কিছুমাত্র প্রশ্ন না কোরেই আমার কথা দেবার শক্তি তুমি নিজের হাতেই যে ভেঙে দিয়েছ রমা !”

রমা আশ্চর্য হইয়া কহিল, “আমি ?” রমেশ বলিল, “তুমি ছাড়া এ শক্তি আর কার ছিল না। রমা, আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বলব। ইচ্ছে হয় বিশ্বাস কোরো, না হয় কোরো না। কিন্তু, জিনিসটা যদি না একেবারে ম’রে নিঃশেষ হয়ে যেত, হয় ত কোনদিনই এ কথা তোমাকে শোনাতে পারতাম না।” বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া, পুনরায় কহিল,—“আজ না কি আর কোনপক্ষেই বেশমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তাই আজ জানাচ্ছি, তোমাকে অদূর আমার সেদিন পর্য্যন্ত কিছুই ছিল না। কিন্তু, কেন জানি ?” রমা মাথা নাড়িয়া জানাইল—“না।” কিন্তু, সমস্ত অন্তঃকরণটা তাহার কেমন একটা লজ্জাকর আশঙ্কার কণ্টকিত হইয়া উঠিল। রমেশ কহিল,—“কিন্তু, শুনে রাগ কোরো না, কিছুমাত্র লজ্জাও পেরো না। মনে কোরো, এ কোন্ পুরা-কালের একটা গল্প শুন্ট মাত্র।” রমা মনে মনে প্রাণপণে বাধা দিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু, মাথা তাহার এমনি ঝুঁকিয়া পড়িল যে, কিছুকই সোজা করিয়া তুলিতে পারিল না। রমেশ

তেমনি শান্ত, মৃদু ও নির্গল্ভকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—“তোমাকে ভালবাস্তাম রমা! আজ আমার মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধ করি, কেউ কখনো বাসেনি; ছেলেবেলা মা’র মুখে শুনতাম, আমাদের বিয়ে হ’বে। তার পরে, যে দিন সমস্ত আশা ভেঙ্গে গেল, সে দিন আমি কোঁদে ফেলেছিলাম, আজও আমার তা’ মনে পড়ে।” কথাগুলো জগন্ত দীসার মত রমার ছই কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নদ্র করিয়া ফেলিতে লাগিল; এবং একান্ত অশ্রু-চিত্ত অশ্রুভূতির অমল, গীর্ষ বেদনায় তাহার বুকের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পদমুখ কাটিয়া কুচি-কুচি করিয়া দিতে লাগিল; কিন্তু, নিবেদ্য করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া নিতান্ত নিরুপায় পাথরের দ্বার্ত্তব মত শুদ্ধ হইয়া বসিয়া, রমা রমেশের বিষাক্ত-মধুর কথা শুনা একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে শুনিয়া বাইতে লাগিল। রমেশ কহিতে লাগিল,—“তুমি ভাবচ, তোমাকে এ সব কাহিনী শোনানো অজ্ঞায়! আমার মনেও সেই সন্দেহ ছিল ব’লেই সে দিন তারকেব্বরে যখন একটি দিনের যত্নে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেলে, তখনও চুপ ক’বে ছিলাম। কিন্তু, সে চুপ ক’রে থাকিটা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।” রমা কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারিল না। কহিল,—“তবে,—আজকেই বাড়ীতে পেয়ে আমাকে অপমান কর্চেন কেন?” রমেশ কহিল,—“অপমান! কিছু না। এর মধ্যে মান-অপমানের কোন কথাই নেই। এ যাদের কথা হ’চ্ছে, সে রমাও কোন দিন তুমি ছিলে না, সে রমেশও আমি আর নেই। যাই হোক, শোন! সে দিন আমার, কেন জানিনে অসংশয় বিশ্বাস হয়েছিল, তুমি বা’ ইচ্ছে বল, বা’ খুঁসি কর, কিন্তু, আমার অন্তর তুমি কিছুতেই সহিতে পারবে না। বোধ করি ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলার একদিন আমাকে ভালবাস্তে, আজও তা’ একেবারে ভুলতে পারনি। তাই ভেবে-ছিলাম, কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে, তোমার ছাপর’দ ব’সে

আহার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে ক'রে যাব। তার পরে সে রাত্রে আব্দুরের নিজের মুখে যখন শুনতে পেলাম, তুমি নিজে—ও কি ? বাইরে এত গোলমাল কিমের ?”

“বাবু—” গোপাল সরকারের ত্রুস্ত ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রমেশ ঘরের বাহিরে আসিতেই সে কহিল,—“বাবু, পুলিশের লোক ভজুরাকে গ্রেপ্তার করেছে।”

“কেন ?”

গোপালের ভয়ে ঠোঁট কাঁপিতেছিল ; সে কোনমতে কহিল,—“পরশু রাত্তিরে রাখানগরের ডাকাতিতে সে নাকি ছিল।” রমেশ ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল,—“আর এক মুহূর্ত্ত থেকো না রমা, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও। পুলিশ খানাতল্লাসি করতে ছাড়বে না।” রমা নীলবর্ণ মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বলিল,—“তোমার কোন ভয় নেই ত ?” রমেশ কহিল,—“বলুতে পারিনে। কত দূর কি দাঁড়িয়েচে, সে ত এখনো জানিনে।” একবার রমার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, একবার তাহার মনে পড়িল, পুলিশে সে দিন তাহার নিজের অভিযোগ করা, তার পরই সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—“আমি যাব না।” রমেশ বিষয়ে মুহূর্ত্তকাল অবাক থাকিয়া বলিল,—“ছি—এখানে থাকতেই নেই রমা—শীগগীর বেরিয়ে যাও।”—বলিয়া আর কোন কথা না শুনিয়া, যতীনের হাত ধরিয়া, জোর করিয়া টানিয়া, এই ছুটি লাইবোনকে খিড়কির পথে বাহির করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

আজ দুই মাস হইতে চলিল, কয়েকজন ডাকাতির আসামীর সঙ্গে ভজুরা হাজতে। সে দিন খানাতল্লাসিতে রমেশের বাড়ীতে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই, এবং ভৈরব আচার্য্য সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে রাত্রে ভজুরা তাহার সঙ্গে তাহার ঘরের পাখ দেখিতে

গিয়াছিল। তথাপি তাহাকে জামিনে থালাস দেওয়া হয় নাই। বেণী আসিয়া কহিল,—“রমা, অনেক চা’ল ভেবে তবে কাজ করতে হয় দিদি, নইলে কি শত্রুকে সহজে জয় করা যায়! সে দিন মনিবের হুকুমে যে তজ্জুরা লাঠি হাতে ক’রে, বাড়ী চড়াও হয়ে, মাছ আদার করতে এসেছিল, সে কথা যদি না তুমি থানায় লিখিলে রাখতে, আজ কি তা হ’লে ঐ ব্যাটাকে এমন কারবার পাওয়া যেত! অমান ঐ সঙ্গে বমেশ্বর নামটাও যদি আরও দু’কথা বাড়িয়ে শুঁছে লিপিতে দিতিস্ বোন! আমার কথাটার তখন তোরা ত কেউ বাণ দিলেন!” রমা এমনি শ্রান উঠিল যে, বেণী দেখিতে পাইয়া কহিল,—“না না, তোমাকে সাফী দিতে যেতে হবে না। আর তাই যদি হয়, তাতেই বা কি! জামিদারী করতে গেলে কিছুতেই হটলে ত চলে না।” রমা কোন কথা কহিল না। বেণী কহিতে লাগিল,—“কিন্তু, তাকে ত সহজে পরা চলে না! তবে সেও এবার কম চা’ল চালুচে না দিদি! একটা নূতন একটা ইস্কুল করেছে, এ সঙ্গে আমাদের অনেক কাজ পেতে হবে। এমনিই ত মোচলমান দ্বারা জামিদার ব’লে মানতে চায় না, তা’র ওপর যদি লেখাপড়া গেছে, তা হ’লে জামিদারী থাকে না খাকা সমান হবে, তা’ এখন থেকে ব’লে রাখি: জামিদারী ভাল-মন্দ সবকিছু রমা বরাবর বেণীর পরামর্শ মতই চলে; ইহাতে দুজনের কোন দিন মতভেদ পর্য্যন্ত হয় না। আজ প্রথম রমা তক করিল। কহিল,—“রমেশদার নিজের ক্ষতিও ত এতে কম নয়?” বেণীর নিজেরও এ সবকিছু খটকা অন্ন ছিল না। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বাহা স্থির করিয়াছিল, তাহাই কহিল,—“কি জান রমা, এতে নিজের ক্ষতি ভাববার বিষয়ই নয়—আমরা দুজনে ক্ষতি হলেই ও খুসি। দেখচ না, এসে পর্য্যন্ত কি রকম টাকা ছড়াচ্ছে? চারিদিকে ছোটলোকদের মধ্যে ‘ছোটবাবু’ ‘ছোটবাবু’ একটা রব উঠে গেছে। বেন ওই একটা বাহু, আর আমরা দু’ঘর কিছু নয়।

কিন্তু, ক্লেদিনি এ চলবে না। এই যে পুলিশের নজরে তাকে খাড়া ক'রে দিয়েচ বোন, এতেই তাকে শেষ পর্যন্ত শেষ হ'তে হবে; তা' বলে দিচ্ছি।" বলিয়া বেণী মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হইয়াই লক্ষ্য করিল, সংবাদটা শোনাইয়া তাহার কাছে বৈষ্ণব উৎসাহ ও উদ্বেগ-জন্য আশা করা গিয়াছিল, তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। বরঞ্চ মনে হইল, সে চঠাৎ যেন একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়া প্রস্থ করিল, —“আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম, রমেশদা' জান্তে পেরেছেন?” বেণী কহিল,—“ঠিক জানিনে। কিন্তু, জান্তে পারবেই। ভজুয়ার মকদ্দমায় সব কপাই উঠবে।” রমা আর কোন কথা কহিল না। চুপ করিয়া ভিতরে-ভিতরে সে যেন একটা বড় আঘাত সামলাইতে লাগিল—তাহার কেবলই মনে টটিতে লাগিল, রমেশকে বিপদে ফেলিতে সেই যে সকলের অগ্রণী, এই সংবাদটা আব রমেশের অগোচর রহিবে না। খানিক পরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“আজকাল ওঁর নাম বুঝি সকলের মুখেই বড়না?” বেণী কহিল,—“ওধু আমাদের গ্রামেই নয়, গুনাচ ওর দেশদেখি আরও পাচছ'টা গ্রামে স্কুল করবার, রাস্তা তৈরি করবার আয়োজন হচ্ছে। আজকাল ছোটলোকেরা সবাই বলাবলি করচে, সাহেবদের দেশে গ্রামে গ্রামে একটা দু'টো স্কুল আছে বলেই ওদের এত উন্নতি। রমেশ প্রচার ক'রে দিয়েচে, যেখানেই নূতন ইস্কুল হবে, সেইখানেই ও ছ'শ ক'রে টাকা দেবে।” ওর দাদামহাশয়ের বত টাকা পেয়েচে, সমস্তই ও এইতে ব্যয় করবে। মোচসমানেরা ত ওকে একটা পীর-পরগণ্ডর বলে ঠিক ক'রে ব'সে আছে।” রমার নিজের বুকের ভিতরে এই কথাটা একবার বিহ্বালের মত আলো করিয়া, খেলিয়া গেল, যদি তাহার নিজের নামটাও এই সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারিত! কিন্তু, মুহূর্তের জ্ঞা। পরক্ষণেই দ্বিগুণ আঁধারে তাহার সমস্ত অন্তরটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বেণী কহিতে লাগিল,—“কিন্তু, আমিও... অঙ্কে... ছাড়ব না। সে যে আমাদের

সমস্ত প্রজা এমনি ক'রে বিগড়ে তুলবে, আর জমিদার হয়ে আমরা চোখ মেলে, মুখ বুজে দেখব, সে যেন কেউ যোগেও না ভাবে। এই বাটা ভৈরব আচার্য্য এবার ভক্তুর হ'য়ে সাক্ষী দিবে কি ক'রে তার মেয়ের বিয়ে দেয়, সে আমি একবার ভাল ক'রে দেখব। আরও একটা ভুলি আছে—দেখি গোবিন্দখুড়ো কি বলে। তার পয় দেশে ডাকানি লেগেই আছে। এবার চাকরকে যদি জেলে পুরতে পারি, ত'হার মনিবকে পুরতেও আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। সেই যে প্রথম দিনটিকেই তুমি বলেছিলে রমা, শ্রদ্ধা করতে ইনিও কম করবেন না, সে যে এমন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে, তা' আমিও মনে করিনি।” রমা কোন কথাই কহিল না। নিজের প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণী এমন বর্ণে-বর্ণে সত্য হওয়ার বাকী পাইয়াও যে নারীর মুখ অহঙ্কারে উজ্জ্বল হইয়া উঠে না, বরঞ্চ নিবিড় কালিন্দার আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সে যে তাহার কি অবস্থা, সে কথা বুঝিবার শক্তি বেগীর নাই। তা' না থাকুক, কিন্তু, জিনিষটা এতই স্পষ্ট যে, কাহারই দৃষ্টি এড়াইবার সম্ভাবনা ছিল না—তাহারও এড়াইল না। মনে মনে একটু বিষয়াপন্ন হইয়াই বেগী রান্নাঘরে যাইয়া মাসীর সহিত ছুট একটা কথা কহিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, রমা হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—“আচ্ছা এড়না, রমেশনা’ যদি জেলেই যান, সে কি আমাদের নিজেদের ভারি কলঙ্কের কথা নয়?” বেগী অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া দ্বিজ্ঞাসা করিল,—“কেন?” রমা কহিল,—“আমাদের আত্মীয়, আমরা যদি না বাটাই, সমস্ত লোক আমাদেরই ত ছি ছি ক'রবে।” বেগী জবাব দিল,—“যে যেমন কাজ করবে, সে তার ফল ভুগবে, আমাদের কি?” রমা তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—“কিন্তু, রমেশনা’ সত্যিই ত আর চুরি-ডাকাতি ক'রে বেড়ান না। বরং, পরের ভালর জন্তই নিজের সর্বস্ব দিচ্ছেন, সে কথা ত কারো কাছে চাপা থাকবে না। তার পর আমাদের

নিজের দেহও ত গায়ের মধ্যে মুখ বার করতে হবে!” বেণী হি-হি করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল,—“তোমার হ’ল কি বলত বোন?” রমা এই লোকটার মুখের সঙ্গে রমেশের মুখখানা মনে মনে একবার দেখিয়া লইয়া আর যেন সোজা করিয়া মাথা তুলিতেই পারিল না। কহিল,—“গায়ের লোক ভয়ে মুখের সামনে কিছু না বলুক, আড়ালে বলবেই; তুমি বলবে, আড়ালে রাজার মাকেও ডা’ন বলে; কিন্তু, ভগবান ত আছেন। নিবপনারীকে মিছে করে শাস্তি দেওয়া-তিনি ত রেহাই দেবেন না।” বেণী কৃত্রিম স্ফোভ প্রকাশ করিয়া কহিল,—“হা রে আমার কপাল! সে ছোঁড়া বৃদ্ধি ঠাকুরদেবতা কিছু মানে! শীতলা-ঠাকুরের ঘণ্টা প’ড়ে যাচ্ছে—মেয়ামত করবার জন্তে তার কাছে লোক পাঠাতে সে ইঁাকিয়ে দিয়ে বলেছিল,—‘যারা তোমাদের পাঠিয়েছে, তাদের বল গে বাজে খরচ করবার টাকা আমার নেই। শোন কথা! এটা তার কাছে বাজে খরচ? আর কাজের খরচ হচ্ছে, মোচলমানদের ইস্কুল ক’রে দেওয়া। তা’ ছাড়া বামুনের ছেলে,—সন্ধ্যা-আহ্নিক কিছু করে না! শুন, মোচলমানের হাতে জল পর্যন্ত যায়। ছ’পাতা ইংরিজী প’ড়ে আর কি তার জ্ঞাত-জ্ঞান আছে দিদি, কিছুই নেই। শাস্তি তার গেছে কোথা, সমস্তই তোলা আছে; সে একদিন সবাই দেখতে পাবে।” রমা আর বানানুবাদ না করিয়া মোন হইয়া রহিল বটে, কিন্তু, রমেশের অনাচার এবং ঠাকুরদেবতার অশ্রদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া, মনটা তাহার আবার তাহার প্রতি বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল। বেণী নিজের মনে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল। রমা অনেকক্ষণ পর্যন্ত একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নিজের ঘরে গিয়া, মেঝের উপরে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সে দিন তাহার একাকিনী খাবার হাদ্যমা নাই মনে করিয়া আজ সে যেন স্বজিবোধ করিল।



বর্ষা শেষ হইয়া আগামী পূজার আনন্দ এবং ম্যালেরিয়া ভীতি বাঙালয় পল্লী-জননীর আকাশে, বাতাসে এবং আলোকে উকি-কুঁকি মাঝিতে লাগিল। রমেশও আর পড়িল। গত বৎসর এই রাক্ষসীর প্রাক্রমণকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু, এ বৎসরে আর পারিল না। তিন দিন জ্বরভোগে পর আজ সকালে উঠিয়া, খুব খানকটা কুইনিন্ গিলিয়া লইয়া জানালার বাহিরে পীতাম্বরোদ্ভের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমস্ত অনাবশ্যক ডোবা ও জঙ্গলের বিকল্পে গ্রামবাসীকে সচেতন করা সম্ভব কিনা। এই তিনদিন যাত্র অবসারণ করিয়াই সে সশষ্ট বুঝিয়াছিল, যা' হোক, কিছু একটা করিতেই হইবে। মানুষ হইয়া সে যদি নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া প্রতি বৎসর, মাসের পবনাস, মানুষকে এই রোগভাগ করিতে দেয়, উগ্ৰমানু তাহাকে ক্ষমা করবেন না। কয়েকদিন পূর্বে এই প্রদম্ব আলোচনা করিয়া সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, ইহার ভীষণ অপকামিতা সম্বন্ধে গ্রামের লোকেরা যে একেবারেই অজ্ঞ, তাহা নহে; কিন্তু, পনের ডোবা বুজাইয়া এবং জমর জঙ্গল কাটিয়া, কেহই ঘরের খাইয়া খনের মাইষ তাড়াইয়া বেড়াইতে রাজী নহে। যাহাব নিজের ডোবা ও জঙ্গল আছে, সে এই বলিয়া তর্ক করে যে, এ সকল তাহাব নিজের কৃত নহ—বাপ পিতামহের দিন হইতেই আছে। স্বতবাং যাহাদের গরজ, তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে পারে, তাহাতে অস্বস্তি নাই; কিন্তু, নিজে সে এজল পরমা এবং উগ্রম ব্যয় করতে অপারগ। রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, এমন অনেক গ্রাম পাশাপাশি আছে, যেখানে একটা গ্রাম ম্যালেরিয়ার উজাড় হইতেছে, অথচ, আর একটার ইহাব প্রকোপ নাই বলিলেই হয়। ভাবিতেছিল, একটুকু স্নহ হইলেই, এটরূপ একটা গ্রাম সে.

নিজের চেখে গিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিবে এবং তাহার গবে  
নিজের কর্তব্য স্থির করিবে। কারণ, তাহার নিশ্চিত ধারণা  
কনিয়াছিল, এই ম্যাগেরিয়াহীন গ্রামগুলির জল নিকাশের  
স্বাভাবিক সুবিধা কিছু আছেই বাহা এমনি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ  
না করিলেও। চেষ্টা করিয়া, চোখে আঁতুল দিয়া দেখাইয়া দিলে,  
লোকে দেখিতে পাইবে। অন্ততঃ, তাহার নিতান্ত অমূল্য পীর-  
গ্রামের মুসলমান প্রজারা চক্ষু মেলিবেই। তাহার ইন্জিনিয়ারিং  
শিক্ষা এতদিন পবে এমন একটা মহৎ কাজে লাগাইবার সুযোগ  
উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সে মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

“ছেটিবারু?” অকস্মাৎ কান্নার স্বরে আহ্বান শুনিয়া রমেশ  
মহাবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল ভৈরব আচার্য্য ঘরের মেঝের  
উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া জীলোকের জায় ফুলিয়া ফুলিয়া  
কাঁদিতেছে। এতদূর ৭৮ বৎসরের একটি কত্থা সঙ্গে আসিয়াছিল;  
বাপের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার চীৎকারে ঘর ভরিয়া উঠিল।  
দেখিতে দেখিতে বাড়ির লোক, যে যেখানে ছিল, দোর-গোড়ার  
আশ্রয় ভিত্ত করিয়া দাড়াইল। রমেশ কেমন যেন একরকম  
হতভম্ব হইয়া গেল। এই লোকটার কে মরিল, কি সর্বনাশ হইল,  
কারণে জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন করিয়া কান্না থামাইবে, কিছুই  
যেন তাহা পাইল না। গোপাল সরকার কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া  
আসিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া  
প্রাণান্তেই ভৈরব উঠিয়া বসিয়া ছুই বাহু দিয়া গোপালের গলা  
তড়াইয়া ধরিয়া, ভয়ানক আর্তনাদ করিয়া উঠিল। এই লোকটা  
আঁত-অশ্রুতেই মেয়েদের মত কাঁদিয়া ফেলে, স্বরণ করিয়া রমেশ  
দ্রমশঃ যখন অধীর হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় গোপালের  
বহুদূর সাক্ষনা-বাক্যে ভৈরব অবশেষে চোখ মুছিয়া, কতকটা  
প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিল এবং এই মহাশোকের হেতু বিবৃত করিতে  
প্রস্তুত হইল। বিবরণ শুনিয়া, রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

এত বড় অত্যাচার কোথাও কোনকালে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া সে কল্পনা করিতেও পারিল না। ব্যাপারটা এই। ভৈরবের সাক্ষ্যে ভক্তুরা নিষ্কৃতি পাইলে তাহাকে পুলিশের স্নেহ-দৃষ্টির বহির্ভূত করিতে রমেশ তাহাকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিল। আসামী পরিচালন পাইল বটে, কিন্তু, সাক্ষী ফাঁদে পড়িল। কেমন করিয়া যেন বাতাসে নিজের বিপদের বার্তা পাইয়া, ভৈরব কা'ল সদরে গিয়া সন্ধান লইয়া অবগত হইয়াছে যে, দিন পাঁচ-ছয় পূর্বে বেণী খুড়খণ্ডের রাখানগরের সনাত মুণ্ডুয়া ভৈরবের নামে সুদে-আসলে এগারশ' ছাব্বিশ টাকা সাত আনার ডিক্রি করিয়াছে এবং একদিনের মধ্যেই তাহার বাস্তবতা ক্রোক করিয়া নীলাম ডাকিয়া লইবে। ইহা একতরফা ডিক্রি নহে। মণ্ডারীতি শমন বাহির হইয়াছে, কে তাহা ভৈরবের নামে নথ্য করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধার্য্যদিনে আদালতে জাজি হইয়া নিজেই ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া, কবলজবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার পূর্ণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফাঁদবান্ধী মিথ্যা। এই সর্বব্যাপী মণ্ডার আশ্রয়ে সবল দুর্বলের বধ্যসর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া, তাহাকে পনের ভিখারী করিয়া, বাহিন করিয়া, দিবার উদ্দেশ্য করিয়াছে; অথচ, সরকারের আদালতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের উপায় সহজ নহে। আইনমত সমস্ত মিথ্যাস্বর্ণ বিচারালয়ে গচ্ছিত না কার্য্য কথাটি কহিবার জো নাই। মাণ্ডা খুঁড়িয়া মাঝে মাঝে তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। কিন্তু, এত টাকা দরিদ্র ভৈরব কোথায় পাইবে যে, তাহা জমা দিয়া, এই মহা-অগ্নাঘের বিপক্ষে জারানচাঙ্গ প্রার্থনা করিয়া আশ্রয়লাভ করিবে। সুতরাং রাজার আদেশ, আদালত, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত মাথার উপর থাকিতেও দরিদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশব্দে মরিতে হইবে। অথচ, সমস্তই বেণী ও গোবিন্দ গাঙ্গুলির কাজ, তাহাতে কান্নাও সন্দেহ নাই; এবং এই অত্যাচারে যত বড় দুর্গতিই ভৈরবের অন্তরে ঘটুক, গামের

সকলেই চুপিচুপি করনা করিয়া ফিরিবে, কিন্তু, একটি লোকও মাথা উঁচু করিয়া প্রকাশে প্রতিবাদ করিবে না। কারণ, তাহারা কাজারো সাতেরঙ থাকে না, পাঁচেরঙ থাকে না ; এবং পরের কথাও কথা কহা তাহারা ভালই বাসে না। সে বাই হউক, রমেশ কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল, পল্লীবাসী দরিদ্র প্রজার উপর অসহ্যেতে অত্যাচার কদিবার সাহস ইহারা কোথায় পায়। এবং কেমন করিয়া দেশের আইনকেই ইহারা কসাইয়ের ছুরিব মত ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং অর্থবল এবং কুটব্যুদ্ধ একদিকে যেমন তাহাদিগকে রাজার শাসন হইতে অব্যাহাত দেয়, মৃতসমাজও তেমনি অন্যদিকে তাহাদের দুষ্কৃতির কোন দণ্ডবিধান করে না। তাই, ইহারা সহস্র অজ্ঞার করিয়াও, সত্যার্থনিহীন মৃত পল্লী-সমাজের মাথায় পা দিয়া এমন নিকপদ্রবে এবং বখেচ্ছাচারে বাস করে। আজ, তাহাদের জ্যাঠাইমার কথাগুলো বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। সে দিন সেই যে তিনি মন্থাস্তিক হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—“রমেশ, চুলোয় যাক্ গে তোদের জাত-বিচারের, ভাল-মন্দ স্বগড়া-ঝাঁটি; বাবা, শুধু আলো জ্বলে দে রে, শুধু আলো জ্বলে দে। গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কাণা হয়ে গেল; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা ক’রে দে, বাবা! তখন আপনি দেখতে পাবে তারা, কোনটা কালো, কোনটা ধলো।” তিনি আরও বলিয়াছিলেন,—“যদি ফিরেই এলোঁছিন্ বাবা, তবে আর চ’লে যাসনে। ভোরা মুখ ফিরায়ে থাকিস্ বলেই তোদের পল্লী-জননীর এই দুর্দশা!” সত্যাই তা! সে চালিয়া গেলে ত ইহাব প্রতিকারের লেশমাত্র উপায় থাকিত না!

রমেশ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল,—“হায় রে! এই আমাদের গর্বের ধন—বাঙালার শুদ্ধ, শাস্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ পল্লীসমাজ!” একদিন হয় ত, যখন ইহার আশ ছিল, তখন হঠাৎ

শাসন করিয়া, আশ্রিত নর-নারীকে সংসারবাড়ার পথে নির্বিঘ্নে বহন করিয়া লইয়া যাইবারও ইহার শক্তি ছিল। কিন্তু, আজ ইহা মৃত; তথাপি অন্ধ পল্লীবাসীরা এই গুরুভার বিকৃত শব্দেহটাকে পরিভ্যাগ না করিয়া, মিথ্যা-মনতার রাত্রি-দিন মাথায় বহিয়া বহিয়া, এমন দিনের-পর-দিন ক্লান্ত, অবসন্ন ও নিজ্জীব হইয়া উঠিতেছে,—কিছুতেই চক্ষু চাটিয়া দেখিতেছে না। যে বস্ত্র আর্দ্রকে রক্ষা করে না, শুধু বিপন্ন করে, তাহাকেই সমাজ বলিয়া কল্পনা করার মহাপাপ তাহাদিগকে নিয়ত রসাতলের পানেই টানিয়া নামাইতেছে। রমেশ আরও কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া, সম্মা যেন ধাক্কা-খাইয়া উঠিয়া পড়িল, এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত টাকাটার একখানা চেক লিখিয়া, গোপাল সরকারের হাতে দিয়া কহিল,—“আপনি সমস্ত বিষয় নিজে ভাল ক’রে জেনে, টাকাটা ফরা দিয়ে দেবেন, এবং যেমন ক’রে হোক, পুনর্বিচারের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ক’রে আসবেন। এমন ভয়ঙ্কর অত্যাচার করবাব সাহস তাদের আর যেন কোন দিন না হয়।” চেক হাতে করিয়া গোপাল সরকার ও ভৈরব উভয়ে কিছুক্ষণ যেন বিহ্বলসেব মত চাটিয়া রহিল। রমেশ পুনর্বার যখন নিজের বক্তব্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া কহিল এবং সে যে তামাসা করিতেছে না, তাহা নিঃসন্দেহে যখন বুঝা গেল, তখন অকস্মাৎ ভৈরব ছুটিয়া আসিয়া পাগলের ভায় রমেশের দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কাদিয়া, টেঁচাইয়া আশীর্বাদ করিয়া, এমন কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, রমেশের অপেক্ষা অল্পবলশালী লোকের পক্ষে নিজেকে মুক্ত করিয়া লওয়া সেদিন একটা কঠিন কাজ হইত। কথাটা গ্রামময় প্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। সকলেই বুঝিল, বেলী এবং গোবিন্দ এবার সহজে নিষ্কৃতি পাইবে না। ছোটবাবু যে তাহার চির-শত্রুকে হাতে পাইবার অশুভ এই এক টাকা হাতছাড়া করিয়াছে, তাহা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল। কিন্তু, এ কথা কাহারও

করনা কদাও সম্ভবপর ছিল না যে, তর্কাল ভৈরবের পরিবর্তে ভগবান্ তাহার উপর এই গভীর দৃষ্টির গুরুভার তুলিয়া দিলেন, যে তাহা স্বচ্ছন্দে বহিতে পারিলে।

তান পরে মাসখানেক গত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মনে মনে যুদ্ধোষণা করিয়া বমেশ এই একটা মাস তাহার যত্নতত্ত্ব লইয়া এমনি উৎসাহের সহিত নানাস্থানে মাপ-জোক করিয়া কিনিয়াছিলাম, আগামী কালই যে ভৈরবের মকদ্দমা, তাহা প্রায় কুড়িয়াই গিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার পোকালে অকস্মাৎ সে কথা মনে পড়িয়া গেল, রত্ননচৌকির মানাইয়ের তরে। চাকরের কাছে সংবাদ পাইয়া বমেশ আশ্চর্য হইয়া গেল যে, আজ ভৈরব আচার্যের দোহিণের অন্নপ্রাশন। অথচ সে ত কিছুই জানে না। শুনিতে পাইল, ভৈরব জাম্বোজন মন্দ করে নাই। গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে। কিন্তু, বমেশকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল কি না, সে খবর বাড়ীর কেহই দিতে পারিল না। শুধু তাই নয়। তাহার স্মরণ হইল, এত বড় একটা মামলা ভৈরবের মাথাব উপর আসন্ন হইয়া থাকা সত্ত্বেও সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে আসে নাই! বাপাল কি! কিন্তু, এমন কথা তাহার মনে উদয় হইয়াও হইল না যে, সংসারে সমস্ত লোকের মধ্যে ভৈরব তাহাকেই বাদ দিতে পারেন। তাই নিজেই এই অদ্ভুত আশঙ্কার নিজেই লাজ্জিত হইয়া, বমেশ তখনই একটা চান্দর কাঁধে ফেলিয়া একবারে সোজা আচার্য-বাড়ীর উল্লেখে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইতেই দেখিতে পাইল, বেড়ার ধারে দুই-তিনটা গ্রামের কুকুর জড় হইয়া, এঁটো বলাপাত বইয়া বিবাদ করিতেছে এবং অনতিদূরে রত্নন-চৌকিওয়ারা আশুন জ্বলাইয়া তামাক পাইতেছে এবং বাস্ততাও উত্তপ্ত করিতেছে। তিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, উঠানে শত-ছিন্নবুদ্ধ সামিয়ানা খাটানো এবং সমস্ত গ্রামের সবল পাঁচহরটা

কেরোসিনের বহু পুরাতন বাতি মুখ্যে ও বোখালবাটা হইতে চাহিয়া আনিয়া আলা হইয়াছে। তাহারা স্বপ্ন-আলোক এবং অপখ্যাপ্ত ধূম উদগীরণ করিয়া সমস্ত স্থানটাকে ভ্রগন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। খাওয়ানো সমাধা হইয়া গিয়াছিল—বেশী লোক আর ছিল না। পাড়ার মুকুত্বিরা তখন যাই-যাই করিতেছিলেন ; এবং ধর্মদাস হরিহর রায়কে আরও একটুখানি বসিতে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। গোবিন্দ গাঙুলি একটুখানি সরিয়া বসিয়া, কে একজন চায়ার ছেলের সহিত নিরিবিলা আলাপে রত ছিলেন। এমনি সময়ে রমেশ হুঃস্বপ্নের মত একেবারে প্রাক্ষণের বুকের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ইহাদের মুখও যেমন এক মুহূর্ত্তে মনীষণ হইয়া গেল, শত্রুপক্ষীয় এই দুইটা লোককে এই বাটীতেই এমনভাবে যোগ দিতে দেখিয়া রমেশের মুখও উজ্জল হইয়া উঠিল না। কেহই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে অগ্রসর হইল না—এমন কি, একটা কথা পর্য্যন্তও কেহ কহিল না। ভৈরব নিজে সেখানে ছিল না। থানিক পরে সে বাটীর ভিতর হইতে কি একটা কাজে ‘বসি গোবিন্দ দা’—বলিয়া বাহির হইয়াই উঠানের মাঝখানে যেন ভূত দেখিতে পাইল, এবং পরক্ষণেই ছুটিয়া গিয়া বাটীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। রমেশ শুকমুখে একাকী যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন প্রচণ্ড বিষয়ে তাহার মন সসাড় হইয়াছিল। পিছনে ডাক শুনিল,—“বাবা, রমেশ!” ফিরিয়া দেখিল, দীঘু হনহন করিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল,—“চল বাবা, বাড়ী চল।” রমেশ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল মাত্র। চলিতে চলিতে দীঘু বলিতে লাগিল,—“তুমি যে উপকার ওর করেচ বাবা, সে ওর বাপ-মা কর্তৃত্ব না। এ কথা সবাই জানে, কিন্তু, উপায় নাই। কাচ্চা-কাচ্চা নিরেই আমাদের সকলকেই ধর কর্ত্তে হয়; তাই তোমাকে সন্দেহ কর্ত্তে গেলে—বুঝ্লে না বাবা—ভৈরবকেও নেহাৎ

দেখ দেওয়া যায় না—তোমরা সব আজকালকার সহরের ছেলে—  
জাতটাতে তেমন কিছু মানতে চাও না—গাইতেই—বুঝে না,  
বাবা,—৬ দিন পরে এর ছোট মেয়েটিও প্রায় বারো বছরের হ'ল  
ত—পার করতে হবে ত মাথা? আমাদের সমাজের কথা সবই  
জান বাবা—বুঝে না বাবা—” রমেশ অবীরভাবে কহিল,—  
“আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি।” রমেশের বাড়ীর সদরদরজার কাছে  
দাঁড়াইয়া দাঁড় খুঁস হইয়া কহিল,—“বুঝবে বই কি বাবা তোমরা  
ত আবে অবাক নও। ও প্রাঙ্গণকেই বা দোষ দিই কি ক'রে—  
আমাদের বুড়োমানুষের পথকাণের চিন্তাটা—”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ত ঠিক কথা—” বলিয়া রমেশ তাজাতাড়ি  
ভিতরে প্রবেশ করিল। গ্রামের লোক তাহাকে ‘এমশের’  
কহিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার আর বাকী বাকি না। নিজেও  
যেবে মনো আসিয়া, ক্ষোভে, অভিমানে, তাহার দুই চক্ষু জ্বালা  
করিয়া উঠিল। আজ এইটী তাহাকে সবচেয়ে বেশী বাজিল যে,  
বেলী ও গোবিন্দকেই ভৈরব আজ সাদরে ডাঁচিয়া আনিয়াছে, এবং  
গ্রামের লোক সমস্ত জানিয়া-অনিয়াও ভৈরবের এণী ব্যবহারটা শুধু  
মাপ করে নাই, সমাজের খাতরে রমেশকে সে যে স্বহস্তে ন পর্দা  
করে নাই, তাহার এই কাজটাকেই প্রশংসা চক্ষে দেখিতেছে।

“হা, ভগবান্!” সে একটা চৌকির উপর বাসিয়া পড়িয়া  
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—“এ কতই জ্ঞাতের, এ মহাপাতকের  
আশ্রয়স্থল হবে কিসে। এত বড় নিষ্ঠুর অপমান কি ভগবান্ ভুমিই  
করা করতে পারবে?”

এমনি একটা আশঙ্কা যে রমেশের মাথায় একেবারেই আসে  
নাই, তাহা নহে। তথাপি, পরদিন সন্ধ্যার সময় গোলাপ সরকার  
সবর হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন সত্য সত্যই জানাইল যে, ভৈরব



আচার্য্য তাহাদের মাথার উপরেই কাঁটাল ভাঙিয়া ভক্ষণ করিয়াছে, অর্থাৎ সে মকদ্দমার হাজির হয় নাই, এবং তাহা এক-তরফা হইয়া ডিসমিস হইয়া গিয়া তাহাদের পদতল জমা টাকাটা বেণী প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে, তখন এক মুহূর্ত্তেই রমেশের ক্রোধের শিখা বিছাড়েগে তাহার পদতল হইতে ব্রহ্মরক্ষু পূর্বাশু অলিয়া উঠিল। সে দিন ইছাদেব জাল ও জুরাচুরি দমন করিতে যে মিথ্যাকথন সে ভৈরবের হইয়া জমা দিয়াছিল, মহাপাপিষ্ঠ ভৈরব তাহার দ্বারাই নিজেব মাথা বাঁসাইয়া লইয়া পুনরায় বেণীর সহিতই সখা স্থাপন করিয়াছে। তাহার এই কৃতঘ্নতা কল্যাকার অপমানকেও বহু উর্দ্ধ ছাপাইয়া আদ্য রমেশেব মাথার ভিতর প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। রমেশ ঘেমন ছিল, তেমনি খাড়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। আত্ম-সংবরণের কথাটা তাহাব মনেও হইল না। প্রভুর রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া, গোলাপ জিজ্ঞাসা করিল,—“বাবু কি কোথাও যাকেন?” “আস্ চ” বলিয়া রমেশ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ভৈরবের বহির্বাটীতে ঢুকিয়া দেখিল, কেহ নাই। ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন আচার্য্য-গৃহিণী নন্দাদীপ-হাতে প্রাদুর্ভাৱে তুলসীমঞ্চ-মূলে আসিতেছিলেন; অকস্মাৎ রমেশকে সন্মুখে দেখিয়া একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া গেলেন। “কখনও আসে না, সে যে আজ কেন আসিয়াছে, তাহা মনে করিতেই ভয়ে তাঁহার জ্বংপিও একেবারে কণ্টের কাছে ঠেলিয়া আসিল। রমেশ তাঁহাকেই প্রশ্ন করিল,—“আচার্য্য মশাই কই?” গৃহিণী অব্যক্তস্বরে বাহা বলিলেন, তাহা শোনা গেল না বটে, কিন্তু, বুঝা গেল, তিনি ঘরে নাই। রমেশের গারে একটা জামা অবধি ছিল না। সন্ধ্যার অম্পট আলোকে তাহার মুখও ভাল দেখা বাইতেছিল না। এমন সময়ে ভৈরবের বড় মেয়ে লক্ষ্মী ছেল-কোলে গৃহের বাহির হইয়াই এই অপরিচিত লোকটাকে দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“কে না?” তাহার জননী পরিচয় দিতে পারিলেন না, রমেশও কথা কহিল না। লক্ষ্মী

ভাড়াইয়া চেঁচাইয়া ডাকিল,—“বাবা, একটা লোক উঠলে এসে দাঁড়িয়েচে, কথা কয় না।”

“কে রে?” বলিয়া মাথা দিয়া তাহারাপজা ঘরের বাহিরে আসিয়াই একেবারে কাঠ হইয়া গেল। সন্ধ্যার স্নানছায়াতেও সেই দীর্ঘ, ঋজু-দেহ চিনিতে তাহার বাকী রহিয়া না। রমেশ কঠোর-স্বরে ডাকিল,—“নেমে আসুন।” বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজেই উঠিয়া গিয়া বজ্রমুষ্টিতে ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিল,—“কেন এমন কাজ করলেন?” ভৈরব কাদিয়া উঠিল, “মেরে ফেললে রে লক্ষ্মী, বেণী বাবুকে খপর দে।” সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতদ্ধ ছেলে-মেয়ে চেঁচাইয়া কাদিয়া উঠিল এবং চোখের পলকে সন্ধ্যার নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া বচকর্ষ্ঠের গগনভেদী কান্নার রোল সমস্ত পাড়া ব্রহ্ম হইয়া উঠিল। রমেশ তাহাকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া কহিল,—“চুপ। বলুন, কেন এ কাজ করলেন?” ভৈরব উত্তর দিব্য চেষ্টাশত্রু না করিয়া, একভাবে চীৎকার করিয়া গলা কাটাতে লাগিল, এবং নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য টানা ইঁচড়া করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাড়ার মেয়ে-পুরুষে প্রাণশ পাঠপূর্ণ হইয়া গেল; এবং, তাহাঙ্গা দেখিতে আবণ্ড লোক ভিড় করিয়া ভিতরে ঢুকিতে ঠেলা-ঠেলি করিতে লাগিল। কিন্তু, কোথাক্স রমেশ সে দিকে লক্ষ্যই করিল না। শতচক্ষুর কোতুহলী দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে উন্নতের মত ভৈরবকে ধরিয়া একভাবে নাড়া দিতে লাগিল। একে রমেশের গায়ের জোর অতিরঞ্জিত হইয়া প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছিল; তাহাতে তাহার চোখের পানে চাহিয়া এই একবাড়ী লোকের মধ্যে এমন সাহস কাহারও হইল না যে, হতভাগ্য ভৈরবকে ছাড়াইয়া দেয়। গোবিন্দ বাকী লোকসকল ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। বেণী উঁকি দিয়াই পরিচয় ছিলেন, ভৈরব দেখিতে পাইয়া কাদিয়া উঠিল—“বড়বাবু বড়বাবু করপাত করলেন না, চোখের নিমিত্তে কোথায় দিলেই

গেলেন। সহসা জনতাপ মধ্যে একটুখানি পাথর মত হইল এবং পরক্ষণেই রমা দ্রুতপদে আসিয়া রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল,—“হয়েছে—এবান হেড়ে দাঁও।” রমেশ তাহার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া কহিল,—“কেন?” রমা দাতে দাঁত চাপিয়া অশ্রুট ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল,—“এত লোকেব মাঝখানে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু, আমি যে লজ্জায় ম’রে যাই! রমেশ প্রাণপূর্ণ লোকের পানে চাহিয়া, তৎক্ষণাৎ ভৈরবের হাত ছাড়িয়া দিল। বন্য ভেম্বনি মৃদুস্বরে কহিল,—“বাড়ী যাও।” রমেশ দ্বিভুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ এ যেন একটা ভোজবাজি হইয়া গেল। কিন্তু, সে চলিয়া গেলে, রমার প্রতি তাহার এই নিরাশ্রয় বাধ্যতায় সবাই যেন কি এক রকম মুখ-চাওয়া-চাওয়ি কবিত্তে লাগিল এবং এমন জিনিসটা এত আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়া এভাবে শেষ হইয়া যাওয়াটা কাহারই যেন মনঃপূত হইল না।

লোকজন চলিয়া গেল। গোবিন্দ গাঙুলি আত্মপ্রকাশ করিয়া একটা আঙুল তুলিয়া, মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া কহিল,—“বাড়ী চড়াও হয়ে যে আধমরা ক’রে দিয়ে গেল, এর কি করবে, সেই পরামর্শ কর।” ভৈরব ছই হাঁটু বুকের কাছে জড় করিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিল, নিকপায়ভাবে বেগীর মুখপানে চাহিল। রমা তখনও যায় নাই। বেগীর অভিপ্রায় অনুমান করিয়া তাড়াতাড়ি কহিল,—“কিন্তু এ পক্ষের দোষও ত কম নেই বড়দা? তা’ ছাড়া, হয়েছেই বা কি, যে, এই নিরে হৈটে করতে হবে!” বেগী তরানক আশ্চর্য হইয়া কহিল,—“বল কি রমা?” ভৈরবের বড়মেয়ে তখনও একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া কাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। সে দলিতা কণিনীর মত একে-বারে গজ্জাইয়া উঠিল, “তুমি ত ওর হয়ে রক্তবেই রমানিদি! তোমার বাপকে কেউ ধরে হুকৈ ধরে গেলে কি করতে বল ত?”

তাহার গর্জনে রমা প্রথমটা চমকিয়া গেল। সে যে পিতার মুক্তির  
 জন্ত কৃতজ্ঞ নয়—তা' না হয় নাই হইল; কিন্তু, তাহার তীব্রতার  
 ভিতর হইতে এমন একটা কটু শ্লেষের বাঁধ মাগিয়া রমার গায়ে  
 লাগিল যে, সে সবমুহূর্তেই জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু, আত্মসংবরণ  
 করিয়া কহিল,—“আমাব বাপ ও তোমার বাপে অনেক তফাৎ  
 লক্ষ্যী, তুমি সে তুলনা কোরো না। কিন্তু, আমি কারও হয়েই  
 কোন কথা বলিনি, ভালবাসা বলিছিলাম।” লক্ষ্মী পাড়াগাঁয়ে  
 মেয়ে, অগভীর মনটু নহে। সে জ্যাঁড়িয়া আসিয়া বলিল,—  
 “বটে! ওর হয়ে কৌদল করতে তোমার লজ্জা করে না?  
 বড়লোকের মেয়ে বলে, কেউ ভয়ে কথা কয় না—নইলে কেন  
 না শুনিতে? তুমি বলে তার মুখ দেখাও, তার কেউ হ'লে গসায়  
 দিড়ি দিত।” —এ লক্ষ্মীকে একটা হাডা দিয়া বলিল,—“তুই খামু  
 না কখন! এ ছাড়া ক'সে কথায়?” লক্ষ্মী কহিল,—“কাজ নেই  
 কেন? যাব জগে বাবাতে এক চাপ পেতে হ'ল, তার হয়েই উনি  
 কৌদল করবেন? বাবা যদি আজ মারা যেতেন!” রমা নিমেষের  
 জন্ত ক্রোধে হরহা গিয়াছিল মাত্র। বেণীর কৃত্রিম-ক্রোধের স্বর  
 তাহাকে আবার প্রজ্বলিত করিয়া দিল। সে লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া  
 কহিল,—“লক্ষ্মী, ঠিক মত লোকের হাতে মরতে পাওয়াও ভাগ্যের  
 কথা; আজ মারা পড়লে তোমার বাবা স্বর্গে বেতে পারত।”  
 লক্ষ্মীও জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল,—“ওঃ, তাইতেও বুঝি তুমি মরেচ,  
 রমাদাদি?” রমা আর জবাব দিল না। তাহার দিক্ হইতে মুখ  
 কিরাটয়া লইয়া বেণীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কিন্তু  
 কথাটা কি, তুমিই বল ত বড়না?” বলিয়া সে একদৃষ্টে চাহিয়া  
 রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া বেণীর বুকের  
 ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিল। বেণী ক্ষুভভাবে বলিলেন,—“কি  
 ক'রে জানব বোন। লোকে কত কথা বলে—তাতে কাণ দিলে  
 ভুলে না।” —“লোকে কি বলে?”

বেণী পরম-ভাঙ্কল্যস্তরে কহিলেন,—“বল্লেই বা রমা, লোকের কথাতে ত আর গায়ে ফোকা পড়ে না। বলুক না।” তাহার এই কপট সহানুভূতি রমা টের পাইল। এক মুহূর্ত চূপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—“তোমার গায়ে হয় ত কিছুতেই ফোকা পড়ে না। কিন্তু, সকলের গায়ে ত গুড়ারের চামড়া নেই! কিন্তু, লোককে একথা বলাচ্ছে কে? তুমি?”

“আমি?”

রমা প্রাণপণ-শক্তিতে ভিতরের দুনিবার ক্রোধ সংবরণ করিয়া রাখিতোছিল—এখনও তাহার কণ্ঠস্থরে তাহা প্রকাশ পাইল না। বলিল,—“তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কোন দ্রুতস্থি ত তোমার বাক নেই—চুর, জুয়াচুর, জাল, ঘরে আগুন-দেওয়া, সবই হয়ে গেছে, এটাই বা বাক থাকে কেন?” বেণী হতবুদ্ধ হইয়া হঠাৎ কথা কাততেই পারিল না। রমা কহিল,—“মেরে-মামুষের এর বড় সর্বনাশ যে আর নেই, সে বোকবার তোমার সাধ্য নেই! কিন্তু, জিজ্ঞাসা কর, এ কথার রটনে তোমার লাভ কি?” বেণী ভাত হইয়া বলিল,—“আমার লাভ থাক হবে! লোকে যদি তোমাকে রমেশের বাড়ী থেকে ভোরবেলা বা’র হঠে দেখে—আমি কর্ব কি?” রমা সে কথার কর্ণপাত না করিয়া, বলিতে লাগিল,—“এই লোকের সাম্মুনে আমি আর বলতে চাইনে। কিন্তু, তুমি মনে কোরো না বড়দা’, তোমার মনের ভাব আমি টের পাহান! কিন্তু, এ নিষ্ঠুর ছেনো, আমি মরবার আগে তোমাকেও জ্যান্ত রেখে যাব না।” আচাৰ্য-গৃহিণী এতক্ষণ নিঃশব্দে নিকটে কোথাও দাঁড়াইয়াছিলেন; সরিয়া আসিয়া রমার একটা বাছ খরিয়া ধোমটার ভিতর হইতে মুহূর্তেই বলিলেন,—“পাগল হয়েচ, মা, এখানে তোমাকে না জানে কে?” নিজের কন্ঠ্যর উদ্দেশে বলিলেন,—“লালি, মেরেমামুষ হয়ে মেরেমামুষের নামে এ অপবাদ দিসনে রে, ধর্ম সহবেন না। আজ হিনি জোদের

যে উপকার করেছেন, তোরা মাছুষের মেয়ে হ'লে তা' টের পেতিস্।" বলিয়া টানিয়া রমাকে ঘরে লইয়া গেলেন। আচাৰ্য্য-গ্রহণীর স্বামীর উদ্দেশে এই কঠোর প্লেথ, এবং নিরপেক্ষ সত্য-বাদিতায় উপস্থিত সকলেই যেন কুস্তিত হইয়া সরিয়া পড়িল।

এই ঘটনার কাৰ্য্য-কারণ বড় বড় এবং ঘাই হোক, নিজের কলাকার অনঙ্গসমে রমেশের শিক্ষিত, ভদ্র অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ দুইটা দিন এমনি সঙ্কচিত হইয়া রহিল যে, সে বাটার বাহির হইতেই পারিল না। তথাপি এত লোকের মধ্য হইতে রমা যে স্বেচ্ছায় তাহার লজ্জার অংশ লইতে আসিয়াছিল, এই চিন্তাটা তাহার সমস্ত সজ্জার কালোমেঘের গায়ে দিগন্তলুপ্ত, অতি দীৰ্ঘ বিদ্যুৎ-ক্ষুব্ধের মত কণেকণে যেন সৌন্দৰ্য্য ও মাধুর্য্যের দীপ্তরেখা আঁকিয়া দিতেছিল। তাই তাহার মানির মধ্যেও পরিতৃপ্তির পীড়া ছিল। এই দুঃখ ও সূখের বেদনা লইয়া, সে যখন আরও কিছুদিন তাহার নির্জন-গৃহের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের সঙ্কল্প করিতেছিল, তখন তাহাকেই উপলক্ষ করিয়া বাহিরে যে আর একজনেন মাথার উপর নিরবচ্ছিন্ন লজ্জা ও অপমানের পাহাড় ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

কিন্তু লুকাইয়া থাকিবার সুযোগ তাহার বটিন না। আজ বৈকালে পীরপুরের মুসলমান প্রজারা তাহাদের পঞ্চায়তের বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল। এ বৈঠকের আয়োজন রমেশ নিজেই কিছুদিন পূৰ্বে করিয়া আসিয়াছিল। সেইমত, তাহারা আজ একত্র হইয়া ছোট বাবুর সম্মুখে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে বলিয়া যখন সংবাদ দিয়া গেল, তখন তাহাকে ঘাইবার জন্য উঠিতে হইল। কেন, তাহা বলিতেছি।

রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অনেকেরই এক ফৌজি কবি-জরগা নাই; পত্রের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে, এবং

পরের জমিতে 'জন' খাটিয়া উদারদের সংস্থান করে। হুঁসিন কাজ না পাইলে, কিংবা অল্প-বিস্ত্রে কাজ করিতে না পারিলেই, সপরিবারে উপবাস করে। খোঁজ করিয়া আরও অবগত হইয়া ছিল যে, ইহাদের অনেকেরই একদিন সঙ্গতি ছিল, শুধু ঋণের দ্বায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাধা রাখিয়া ঋণ দেয়, কিন্তু প্রায়ই সুদ গ্রহণ করে না; ফসলের অংশ দাবী করে। সুদ কাঁধে এই ঋণের মূল্য সময়ে সময়ে আসলের অনতিদূরে গিয়া পৌঁছে। সুতরাং একবার যে কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের দ্বায়েই হোক, বা অনাবৃষ্টির অতিবৃষ্টির জন্তই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামুলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়। এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই অবস্থা। কারণ, মহাজনেরা প্রায় হিন্দু। রমেশ সহরে থাকিতে এ সম্বন্ধে বই পড়িয়া বাহা জানিয়াছিল, গ্রামে আসিয়া তাহাই চোখে দেখিয়া, প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার অনেক টাকা ব্যাঙ্কে পড়িয়াছিল। এই টাকা এবং আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া, এই সকল ছুঁতাপাদিগকে মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার কবিলার জন্ত সে কোমর বাধিয়া লাগিল। কিন্তু হুই একটা কাজ করিয়াই থাকা খাইয়া দেখিল যে, এই সকল দরিদ্রদিগকে সে যতটা অসহায় এবং কুপাপাত্ত বলিয়া ভাবিয়াছিল, অনেক সময়েই তাহা ঠিক নয়। ইহারা দরিদ্র নিকুপায় এবং অল্পবুদ্ধিজীবী বটে, কিন্তু, বজ্রাতি বুদ্ধিতে ইহারা কম নহে। ধার করিয়া শোধ না দিবার প্রবৃত্তি ইহাদের যথেষ্ট প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলও নয়, সাধুও নয়। মিথ্যা বলিতে ইহারা অধোবদন হয় না এবং কঁাকি দিতে জানে। প্রতিবেশীর ত্রী কস্তা সম্বন্ধে সৌন্দর্য্যচর্চার সখও মন্দ নাই। পুরুষের বিবাহ হওয়া কঠিন ব্যাপার; অথচ নানা বয়সের বিধবায় প্রতি গৃহস্থ ভারাক্রান্ত। তাই, নৈতিক স্বাস্থ্যও

অতিশয় দুঃখ। সমাজ ইহাদিগের আছে,—তাহার শাসনও কম নয়; কিন্তু পুলিশের সহিত চোরের যে সন্ধ, সমাজের সহিত ইহারা ঠিক সেই সন্ধ পাতাইয়া রাখিয়াছে। অথচ সর্বসময়ে ইহারা এমন গীড়িত, এত দুর্বল, এমন নিঃশব্দ যে, রাগ করিয়া বসিয়া থাকিও অসম্ভব। বিদ্রোহী বিপথগামী সন্তানের প্রতি পিতার মনোভাব যা হয়, রমেশের অন্তরটা ঠিক তেমনি করিতেছিল বলিয়াই আজিকার সন্ধ্যায় সে পীরপুরের নূতন ইন্সুল-ঘরে পলায়েত আহ্বান করিয়াছিল। কিছুক্ষণ হহল, সন্ধ্যার ঝাপসা-ঘোর কাটিয়া গিয়া দশমার জ্যোৎস্নায় জালিলার বাহরে মুক্ত-প্রান্তরের এদিক্ ওদিক্ ভারিয়া গিয়াছিল। সেই দিকে চাইয়া রমেশ বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াও বাই-বাই করিয়া বিলম্ব করিতেছিল। এমন সময়ে রমা আসিয়া তাহার দোরগোড়ায় দাঁড়াইল। সে স্থানটায় আলো ছিল না, রমেশ বাটার দাসী মনে কারিয়া কহিল,—“কি চাও?” “আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন?” রমেশ চমকিয়া উঠিল—“এ কি রমা? এমন সময়ে যে!” যেহেতু তাহাকে সন্ধ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু যে জন্ত সে আসিয়াছিল, সে অনেক কথা। অথচ, কি করিয়া যে আরম্ভ করিবে, ভাবিয়া না পাইয়া রমা স্থির হইয়া রহিল। রমেশও কথা কহিতে পারিল না। ধানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, রমা প্রশ্ন করিল,—“আপনার শরীর এখন কেমন আছে?”

“ভাল নয়। আবার রোজ রাতেই অর হচ্ছে।”

“তা’হলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ত ভাল হয়।” রমেশ হাসিয়া কহিল,—“ভাল ত হয় জানি, কিন্তু, বাই কি ক’রে?” তাহার হাসি দেখিয়া রমা বিরক্ত হইল। কহিল,—“আপনি বলবেন, আপনার অনেক কাজ; কিন্তু এমন কাজ কি আছে, যা নিজের শরীরের চেয়েও বড়?” রমেশ পূর্বের মতই হাসিয়া



কথা দিল,—“নিজের দেহটা যে ছোট জিনিস, তা’ আমি বলিনি। কিন্তু, এমন কাজ মানুষের আছে, বা’ এই দেহটার চেয়ে অনেক বড়,—কিন্তু, সে ত তুমি বুঝবে না রমা।” রমা মাথা নাড়িয়া কহিল,—“আমি বুঝতেও চাইনে। কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতেই হবে। সরকার মশায়কে ব’লে দিয়ে গান, আমি তাঁর কাজকর্ম দেখব।” রমেশ বিস্মিত হইয়া কহিল,—“তুমি আমার কাজকর্ম দেখবে? কিন্তু—”

“কিন্তু কি?”

“কিন্তু কি জানো রমা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারুব কি?” রমা অসঙ্কোচে তৎক্ষণাৎ কহিল,—“ইতরে পারে না, কিন্তু আপনি পারবেন।” তাহার দৃঢ় কণ্ঠের এই অচিন্ত্যনীয় উক্তিতে রমেশ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু, ক্ষণেক মৌন থাকিয়া বলিল,—“আচ্ছা, ভেবে দেখি।” রমা মাথা নাড়িয়া কহিল,—“না, ভাববার সময় নেই,—আজই আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে। না গেলে—” বলিতে বলিতেই সে স্পষ্ট অমৃতভব করিল, রমেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, অকস্মাৎ এমন করিয়া না পলাহলে বিপদ যে কি ঘটতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। রমেশ ঠিকই অনুমান করিল; কিন্তু, আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিল,—“ভাল, তাই যাদ যাই, তাতে তোমার লাভ কি? আমাকে বিপদে কেন্তে তুমি নিজেও ত কম চেষ্টা কর নি যে, আজ আর একটা বিপদে সতর্ক কর্তৃত্ব এসেচ। সে সব কাণ্ড এত পুরাণো হয়নি যে, তোমার মনে নেই। বরং, খুলে বল, আমি খেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়, আমি চ’লে যেতে হয় ত রাজী হতেও পারি।” বলিয়া সে যে—উত্তরের প্রত্যাশায় রমার সম্পূর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহা পাইল না। কত বড় অভিমান যে রমার বুক জুড়িয়া উজ্জ্বলিত, হইয়া উঠিল, তাহাও জানা গেল না; রমেশের নিষ্ঠুর বিজ্ঞপের আঘাতে মুখ যে তাহার কিরূপ

বিবর্ণ হইয়া রহিল, তাহাও অন্ধকারে লক্ষ্য-গোচর হইল না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রমা আপনাকে সামলাইয়া লইল। পরে কহিল,—“আচ্ছা, খুলেই ব'ল্চি। আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।” রমেশ শুক হইয়া বলিল,—“এই ? কিন্তু সাক্ষী না দিলে ?” রমা আবার একটুখানি থামিয়া কহিল,—“না দিলে ? না দিলে ছ'দিন পরে আমার মহামায়ার পূজার কেউ আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ থাকে না—আমার বার-ব্রত—” একরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনামাত্রে রমা যেন শিহরিয়া উঠিল। রমেশের আর না শুনিলেও চলিত, কিন্তু থাকিতে পারিল না। কহিল,—“তার পরে ?” রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল,—“তারও পরে ? না, তুমি যাও—আমি মিনতি কর্চি রমেশদা”,—আমাকে সবদিকে নষ্ট কোরো না ; তুমি যাও,—যাও এদেশ থেকে।” কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। ইতিপূর্বে যেখানে, যে কোন অবস্থায় হোক, রমাকে দেখিলেই রমেশের বুকের রক্ত অশাস্ত হইয়া উঠিত। মনে মনে শত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া, নিজের অন্তরকে সহস্র কটুক্তি করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিত না। হৃদয়ের এই নীরব বিরুদ্ধতার সে হুংখ পাইত, লজ্জা অগ্রভব করিত, জ্বল হইয়া উঠিত ; কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বেশে আনিতে পারিত না। বিশেষ করিয়া আজ এইমাত্র নিজেরই গৃহের মধ্যে সেই রমাকে অকস্মাৎ একাকিনী উপস্থিত হইতে দেখিয়া কল্যাকার কথা স্মরণ করিয়াই তাহার হৃদয়-চাকলা একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। রমার শেষ কথায় এতদিন পরে আজ সেই হৃদয় স্থির হইল। রমার ভব-ব্যাকুল নির্বন্ধতার অর্থও স্বার্থপরতার চেহারা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাব অন্ধ হৃদয়েরও আজ চোখ খুলিয়া গেল। রমেশ গভীর একটা নিখাস ফেলিয়া কহিল,—“আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু আজ আমারদমর নেই। কারণ, আমার পাণাবার হেতুটা যত বড়ই

তোমার কাছে হোক, আজ রাত্রিটা আমার কাছে তার চেয়েও গুরুতর। তোমার দাসীকে ডাকো, আমাকে এখনি বা'র হ'তে হবে।" রমা আস্তে আস্তে বলিল,—“আজ কি কোনমতেই বাওয়া হ'তে পারে না?” “না। তোমার দাসী গেল কোথায়?” “কেউ আমার সঙ্গে আসেনি।” রমেশ অবাক হইয়া বলিল,—“সে কি কথা! এখানে একা এলে কোন্ সাহসে? একজন দাসী পর্য্যন্ত সঙ্গে ক'রে আননি।” রমা হেম্মনি মুদ স্বরে কহিল,—“তাতেই বা কি হ'ত? সেও ত আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষে ক'রতে পারত না।” “তা না পারুক, লোকের মিথ্যা ভরসা থেকে ত বাঁচতে পারত! রাত্রি কম হয়নি রাগি।” সেই বহুদিনের বিগত নাম! সহসা কি একটা বলিবার জন্ত বমার অভ্যন্ত আবেগ উপস্থিত হইল, কিন্তু সে সংবরণ করিয়া ফেলিল। তার পর শুধু কহিল,—“তাতেও ফল হ'ত না রমেশবাবু!” অন্ধকার রাত্রি নয়—আমি বেশ ঘেঁতে পারব।” বলিয়া আর কোন কথাই জ্ঞাত অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

## ১৬

প্রতি বৎসর রমা ষটা করিয়া দুর্গোৎসব করিত এবং প্রথম পূজার দিনেই গ্রামের সমস্ত চাষাভূষা প্রভৃতিকে পরিতোষপূরক ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণ-বাটীতে মাঘের প্রসাদ পাইয়াও তত্ত্ব এমনি হুড়ামুড় পড়িয়া বাইত যে, রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত ভাঙে-পাতায়, এঁটোতে-কাঁটাতে বাড়ীতে পা ফেলিবার জায়গা থাকত না। শুধু হিন্দু নয়, পীরগুরুর প্রজারাও ভিড় করিতে ছাড়িত না। এবারেও সে নিজে অল্পস্থলী সবেও আয়োজনের ক্রটি করে নাই; চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা ও পূজার সাজ-সরঞ্জাম। নাচে উৎসবের প্রশস্ত প্রাপ্ত। সপ্তমীপূজা যথাসময়ে সমাধা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়াইয়া, তাহাও শেষ হইতে বসিয়াছে।

আকাশে সপ্তমীর ঝণ্ড-চন্ডে পরিখুঁট হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু মুখ্যো-বাড়ীর মস্ত উঠান জনকরেক ভঙ্গলোক বাতীত একেবারে শূন্য, খা খা করিতেছে। বাড়ীর ভিতরে অন্তর বিরাট স্তূপ ক্রমে জমাট বাধিয়া কঠিন হইতে লাগিল, ব্যঙ্গনের রাশি শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একজন চাষাও মায়ের প্রসাদ পাইতে বাড়ীতে পা দিল না। ‘ইস্!’ এত আহাৰ্য্য-পের নষ্ট করিয়া দিতেছে, দেশের ছোট লোকের দল? এত বড় স্পন্দা! বেরা হুঁকা হাতে একবার ভিতরে, একবার বাহিরে, ঠাকাকাকি দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন;—“ব্যাটাঁদের শেখাবো—চাল কেটে তুলে দেব,—এমন ক’রব, তেমন ক’রব ইত্যাদি।” গোবিন্দ, ধর্মদাস, হালদার প্রভৃতি এঁরা রক্তমুখে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আন্দাজ করিতে লাগিলেন, কোন্ শাণার কারসাজিতে এই কাণ্ডটা খটিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের একমত হইয়াছে, এও ত বড় আশ্চর্য্য! এদিকে অন্যরে মাসী ত একে-বারে দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছেন। সেও এক মহামারী ব্যাপাব! এই ভুয়ুস হাঙ্গামার মধ্যে শুধু একজন নীরব হইয়া আছে—সে নিজে রমা। একটি কথাও সে কাহারো বিরুদ্ধে কহে নাই,—কাহাকেও দোষ দেয় নাই, একটা আক্ষেপ বা অভিযোগের কথাও বাক্যে এখন পর্য্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। এ কি সেই রমা? সে যে অতিশয় পীড়িত, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সে নিজে স্বীকার করে না,—হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। রোগে রূপ নষ্ট করে—সে বাক্। কিন্তু, সে অভিমান নাই, সে রাগ নাই—সে জিদ নাই। স্নান চোখ দুটি যেন ব্যথায় ও করুণায় ভরা। একটু লক্ষ্য করিলেই মনে হয়, যেন ঐ দুটি সজল আবরণের নীচে রোদনের সমুদ্র চাপা দেওয়া আছে—মুক্তি পাইলে বিশ্বসংসার ভাসাইয়া দিতে পারে। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের দ্বার দিয়া রমা প্রতিবার পার্শ্বে আসিয়া

দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র শুভানুধ্যায়ীর দল একেবারে তার-স্বরে ছোঁটিলোকদের চোন্দপুরুষের নাম ধরিয়া গালিগালাজ করিতে লাগিল। রমা শুনিয়া নিঃশব্দে একখানি হাসিল। বৌটা হইতে টানিয়া ছিঁড়িবে; মানুষের কাতের মধ্যে ফুল যেমন করিয়া হাসে—ঠিক তেমনি। তাহাতে রাগ-দেহ, আশা-নিরাশা, ভাস-মল, কিছুই প্রকাশ পাইল না। সে হাসি সার্থক কি নিরর্থক, তাই কে জানে।

বেণী প্রশ্ন করিল,—“না, না, এ হাসির কথা নয়, এ বড় সন্দেশের কথা। একবার যখন জান্বে, এর মূল্য কে?” বগিয়া ছুই কাতের নোথ এক করিয়া কহিল,—“তখন এই এমনি করে ছিঁড়ে ফেলবে।” রমা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বেণী কহিতে লাগিল,—“হীরামজাদা ব্যাটারা, এ বুঝিস্নে যে, যার জোরে তোরা জেপ বারস, সেই-রমেশ নিজে যে জেলের ঘানি টান্চে! তোদের মাঝে কতটুকু সময় লাগে?” রমা কোন কথা কহিল না। যে কাজের জন্য আসিয়াছিল, তাহা শেষ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

দেওমাস হইল, বমেশ অট্টহা প্রেরণ করিয়া, ঐভরকে ছুবি মারাব অপরাধে, জেল খাটিতেছে।—মকদ্দমার বাদীর পক্ষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই,—নূতন ম্যাগিস্ট্রেট সাহেব কি করিয়া পূর্বাভূত জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এ প্রকার অপরাধ আসামীর পক্ষে খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। এমন কি, সে ডাকাতি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট কি না, সে বিষয়েও তাহার বশেষ সংশয় আছে। থানায় কেতাব হইতেও তিনি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে, ঠিক এই ধরনের অপরাধ সে পূর্বেও করিয়াছে, এবং আরও অনেক প্রকার সন্দেহজনক ব্যাপার তাহার নামের সহিত জড়িত আছে। ভবিষ্যতে পুলিশ বেন তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে, তিনি এ সমস্ত প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। বেণী সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, তবে রমাকে সাক্ষ্য দিতে হইয়া-

ছিল। সে कहিয়াছিল, “রমেশ বাড়ী ছুকিয়া আচার্য্য মহাশয়কে মারিতে আসিয়াছিল, তাহা সে জানে। কিন্তু ছুরি মারিয়াছিল কি না, জ্ঞানেন না, হাতে তাহার ছুরি ছিল কি না, তাহাও তাহার স্মরণ হয় না।” কিন্তু এই কি সত্য? জেলার বিচারালয়ে হলক্ কদিয়া রমা এই কথা বলিয়া আসিল; কিন্তু যে বিচারালয়ে হলক্ কবার কথা নাই, সেখানে সে কি ভাব দিবে! তাহার অপেক্ষা কে কদিক নিঃসংশয়ে জানিত, রমেশ ছুরিও মারে নাই, হাতে তাহার ছুরি থাকা নব্বের কথা, এখটা তদ্বৎ পর্য্যন্ত ছিল না। সে আদালতে একথা শুনি কেহ তাহাকে ভিজ্ঞাসা পয়াস্ত করিবে না, সে কি স্মরণ কাবতে পাবে এবং বি পাবে না! কিন্তু, এখানকার আদালতে সত্য বলবার যে তাহার একটুকু পথ ছিল না! বেণী প্রভৃতি বংশধরা পল্লী সমাজ সভা চাহে নাই। স্মৃতবাং সত্যের মুখোত থাকে যে মধ্যা অপবাদে পাত্ কালী নিজের মুখময় মাপিয়া, এই সমাজের সাহরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে—এমন ত অনেকই হইয়াছে—এ কথা সে যে নিঃসংশয়ে জানিত। তা ছাড়া, এত বড় গুরুদণ্ডের কথা, রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। বড় জোর হুশ একশ জরিমানা হইবে, হইতে জানিত। বরক, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও রমেশ যখন তাহার কাজ ছাড়িয়া কোনমতেই পলাইতে স্বীকার করে নাই, তখন রাগ করিয়া রমা মনে মনে এ কামনাও করিয়াছিল, হৌক জরিমানা। একবার শিক্ষা হইয়া যাক্। কিন্তু সে শিক্ষা যে এমন করিয়া হইবে, রমেশের রোগক্রিষ্ট পাণ্ডুর মুখের প্রাত চাহিয়াও বিচারকের দয়া হইবে না—একবারে ছয়মাস মশ্রম-কাবাখাসের হকুম করিয়া দিবে—তাহা সে ভাবে নাই। সে সময়ে রমা নিজের রমেশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাবে নাই। পরের মুখে শুনিয়াছিল, রমেশ একদৃষ্টে তাহারই মুখের পানে চাহিয়াছিল, এবং জেলের হকুম হইয়া গেলে, গোপাল সরকারের প্রার্থনার উত্তরে মাথা নাড়িয়া

কহিয়াছিল,—“না। ম্যাক্‌লিষ্টেট আমাকে মারাত্মকভাবে কাব্যরস করিবার হুকুম দিলেও আমি আপিল করিয়া খালাস পাইতে চাই না। বোধ করি, জেল এর চেয়ে ভাল।”

ভালই ত! তাহাদের চিরাহুগত ভৈরব আচার্য্য মিথ্যা নালিশ করিয়া যখন তাহার অণ-শোধ করিল, এবং রমা সাক্ষ্য-মকে দাঁড়াইয়া স্বরণ করিতে পারিল না, তাহার হাতে ছুরি ছিল কি না, তখন আপিল করিয়া মুক্তি চাহিলে সে কিসের জ্ঞাত! তাহার সেই দুর্ভাগ্য ঘৃণা বিরূপ পাষণৎওঁর মত রমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে—কোথাও তাহাকে সে নড়াইয়া বাঁধবার স্থান পাইতেছে না! সে কি গুরুভার! সে মিথ্যা বলিয়া আসে নাই—এ কৌফর্য্য তাহাব অন্তর্য্যামা ত কোনমতেই মঞ্জুর করিল না! মিথ্যা বলে নাই বটে, কিন্তু সত্য প্রকাশও করে নাই। সত্যগোপনের অপরাধ যে এত বড়, সে যে এমন করিয়া তাহাকে অহরহ দণ্ড করিয়া স্বেগিলে, এ যাদ সে একবার জানিতে পাবিত! রাঁহিয়া রাঁহিয়া তাহাব কেবলই মনে পড়ে, ভৈরবের যে অপরাধে রমেশ আত্মহারা হইয়াছিল, সে অপরাধ কত বড়! অথচ, তাহার একটিমাত্র কথাই সে সমস্ত মার্জনা করিয়া—দিকৃষ্টি না করিয়া, চলিয়া গিয়াছিল! তাহার ইচ্ছাকে এমন করিয়া শিরোধার্য্য করিয়া কে কবে, তাহাকে এত সম্মানিত করিয়াছিল! নিজের মধ্যে গুড়িয়া গুড়িয়া আজকাল একটা সত্যের সে যেন দেখা পাইতেছিল! যে, সমাজের ভয়ে সে এত বড় গর্হিত কর্ম্ম করিয়া বসিল, যে সমাজ কোথায়? বেগী প্রভৃতি কয়েকজন সমাজপতির স্বার্থ ও জুর হিংসার বাহিরে কোথাও কি তাহার অস্তিত্ব আছে? গোবিন্দের এক বিধবা ভ্রাতৃবধূর কথা কে না জানে? বেগীর সহিত তাহার সংস্রবের কথা গ্রামের মধ্যে কাহারও অবদিত নাই। অথচ সমাজের আশ্রয়ে সে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আছে; এবং এই বেগীই সমাজপতি। তাহারই সামাজিক-শৃঙ্খল সর্ব্বদা শতপাকে

জড়ায়। বাথাই চরম সার্থকতা! ইহাই হিঁচুয়ানী। কিন্তু যে ভৈরব এক অনর্থের মূল, রমা নিজের দিকে চাতিয়া তাহার উপরেও আর রাগ কবিত্তে পারিত না। মেয়ে তত্কার বারো বছরের হইরাছে—অতি শীঘ্র বিবাহ দিতে না পারিলে ‘একঘরে’ হইতে হইবে—এবং বাড়ীপুঙ্খ লোকের জ্ঞাতি নাইবে। এ প্রমাদের আশঙ্কামাত্রেরই ত পত্যেক হিন্দুর হাত-পা পেটের ভিতর ঢুকিয়া যায়! সে নিজে তাহার এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে সনাতন ভয় কাটাইতে পারে নাই—গরীব ভৈরব কাটাইবে কি করিয়া! বেণীর বিকল্পতা করা তাহার পক্ষে কি ভরানক মারাত্মক ব্যাপার, এ কথা ত কোনমতেই সে অস্বীকার কবিত্তে পারে না।

বুদ্ধ সনাতন রাজবা বাটীর সমুখ দিয়া বাহতেছিল, গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া ডাকা-ডাকি, ‘অনুগ্রহ-বিনয়, শেষকালে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বেণীবাবুর সাম্মুখে হাথির করিয়া দিল।’ বেণী এসম হইয়া কহিল,—“এত দেমাক কবে খোবে হ’ল রে সনাতন? বলি, তোদের খাড়ে কি আজকাল আর একটা ক’বে মাথা গজিয়েচে বে?” সনাতন কহিল,—“হুটো ক’রে মাথা আর কার থাকে বড় বাবু? আপনাদেরই থাকে না ত, আমাদের মত গরীবের?” “কি বল্‌বি রে! বলিয়া দাঁক দিয়া বেণী ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিয়া গেল; ইহারই সর্বস্ব যে দিন বেণীর হাতে পড়া ছিল, তখন এই সনাতন ছ’বেলা আনিয়া বড়বাবুর পদাধীন করিয়া যাঁইত—আজ তাহাবই হাত এই কথা! সনাতন কহিল,—“হুটো মাথা করে থাকে না, দেই কথাই বলেচ বড়বাবু, আব কিছু নয়।” গোবিন্দ রসান দিয়া কহিল,—“তোদের বুকের পাটা শুধু দেখ’চি আমরা! মায়ের প্রসাদ পেতেও কেউ তোরা এলি নে, বলি, কেন বল্‌ ত রে?” বুড়া একটুখানি হাসিয়া কহিল,—“আর বুকের পাটা! বা’ করবার, সে ত আপনারা আমাব করেচেন। সে যাক্: কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন, আর যাই বলুন,



কোন কৈবর্তই আর বামুন-বাড়ীতে পাত পাত বে না। এত পাপ যে মা বহুমতী কেমন ক'রে সহ্যচেন, তাই আমরা কেবল বলাবলি করি।” বলিয়া একটা নিখাস ফেলিয়া সনাতন রমার প্রতি চাহিয়া কহিল,—“একটু সাবধানে থেকো দিদিঠাকরণ, পৌরপুরের মোচলমান হৌড়ারা একেবারে স্বেপে রয়েছে। ছোটবাবু ফিরে এলে যে কি কাণ্ড হবে, তা ঐ মা ভগ্নিই জানেন। এর মধ্যেই ছোটো তিনটে বার তাবা বড়বাবুর বাড়ীর চারপাশে ঘুরেফিরে গেছে—সামুনে পায়নি, তাই ফেরে।” বলিয়া সে বেগীর দিকে চাহিল। চক্ষের নীচের বেগীর জুড় মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। সনাতন কহিতে লাগিল,—“ঠাকুরের স্নমুখে মিথো বলিচেন, বড়বাবু একটু সামলে-স্নমলে থাকবেন। বাত-বিবিরে বার হবেন না—কে কোথায় ওত পেতে বসে থাকবে, বসা যায় না ত। বেগী কি একটা বলিতে গেল, কিছু মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইল না। তাহার মত ভীক লোক বোধ করি সংসারে ছিল না।

এতক্ষণে রমা কথা কহিল। স্নেহাৰ্প করণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—“সনাতন, ছোটবাবুর জন্মেই বখি তোমাদের সব এত রাগ?” সনাতন প্রতিমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—“গিঁথো বলে আব নরকে গাব কেন দিদিঠাকরণ, তাই বটে! তবে, মোচলমানদের রাগটাই সব চেয়ে বেশী। তারা ছোটবাবুকে হিংস্রদের পরগধর মনে করে। তার সাক্ষী দেখুন, আপনারা—জাকর আলি, আঙুল দিয়ে ঘাস জল গলে না, সে ছোটবাবুর জেলের দিন তাদের ঈশ্বরের জন্মে একটি হাজার টাকা দান করেছে! শুনি মঙ্গলদে তাঁর নাম ক'রে নাকি নেমাজ পড়া পর্যন্ত হয়।” রবার শুষ্ক জ্ঞান মুখখানি অব্যক্ত-আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া প্রদীপ্ত নির্নিমেষ চোখে সনাতনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বেগী অবশ্যই সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—“তোকে একবার দারোগার কাছে গিয়ে

বলতে হলে, সনাতন! তুই যা' চাইবি তাই তোকে দেবে, ছ'বিষে  
জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস ত তাই পাবি, ঠাকুরের সাম্মানে বসে দিকি  
করদি, সনাতন বামুনব কথাটা রাখ।" সনাতন বিস্মিতের মত  
কিছুক্ষণ দাঁড়ি মূগুপানে চাহিয়া থাকিয়া ক'হিল,—"আর ক'টা  
দিন বা বাটুব বড়বাবু! লোভে পড়ে যদি এ কাজ করি, মূল্যে  
আমাকে তোলা চুলোয় থাক, পা দিয়েও কেউ ছেঁবে না; সে  
দিন ক'লে আর নেই বড়বাবু—সে 'মন-কাগ আর নেই! ছোটবাবু  
সব উল্টে দিয়ে গেছে।" গোবিন্দ ক'হিল,—“বামুনের কথা  
হ্যাঁ উল্টে রাপ'রনে ব'ল' সনাতন মাথা নাড়িয়া বলিল,—“না।  
বললে তুমি বাগ করবে গাঙ্গুলি লগাত, কিন্তু সে দিন পৌরপুরের  
নতুন হুকুমঘরে ছোটবাবু বসে ক'লন, 'সবাব গাঙ্গুলি ত কতো  
খোলামনে থাকেনেই বামুন হ'ল না।' আর ত আর আজকের  
নয় ঠাকুর, সব জ্ঞান যা কবে তুমি বেড়াও, সে যে বামুনের  
কাজে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করবে দাদিঠাকুর। তুমিই বল  
দেখ?" কমা নিব'হবে মাথা হেঁট করিল। সনাতন উৎসাহিত  
হইয়া মনের আক্ৰোশ মিটাইয়া বলিতে লাগিল,—“বিশেষ ক'রে  
ডোঁড়াদের মত। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে এই ছুটে গাঁয়ের  
মত ছোকরা, সজোর পর সবাই গিয়ে জোটে জাকর আলির  
বাড়ীতে। তারা ত চারিমিকে, পল্লী'লে বেড়াচ্ছে, আমদার ত  
ছোটবাবু! আর সব চোর-ডাকাত। তা ছাড়া খাজনা দিয়ে  
বাস করব—ভয় কাঙ্কে কর না। আর বামুনের মত থাকে ত  
বামুন, না থাকে আমরাও যা' তারাও তাই। বেণী আতঙ্কে  
পরিপূর্ণ হইয়া শুকনুখে প্রশ্ন করিল,—“সনাতন, আমার ওপরেই  
তাদের এত রাগ কেন, বলতে পারিস?" সনাতন ক'হিল,—“রাগ  
কোথো না বড়বাবু, কিন্তু আপনি যে সকল নটের গোড়া, তা  
তাদের জান'কে বাকী নেই।" বেণী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।  
ছোটলোক সনাতনের মুখে এমন কথাটা শুনিয়াও সে রাগ করিল

না, কারণ, রাগ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না—  
ভয়ে বৃকের ভিতর ঢিপ-ঢপ করিতেছিল। গোবিন্দ কহিল,—  
“তা হ’লে জাকরের বাড়িতেই আড্ডা বল ? সেখানে তারা কি  
করে, বলতে পারিস্ ?” সনাতন তাহার মুখপানে চাহিয়া কি যেন  
চিন্তা করিল। শেষে কহিল,—“কি করে তারা, জানিনে, কিন্তু  
জাল চাও ত সে সব মতলব কোরো না ঠাকুর। তারা হিন্দু-  
মুসলমান ভাই সম্পর্ক পাতয়েছে—এক মন, এক প্রাণ।  
ছোটবাবু জেল হওয়া থেকে, সব রাগে লাকড় হয়ে আছে, তার  
মধ্যে গিয়ে চকুম’ক চুকে অগুন জালতে যেও না ঠাকুর।”

সনাতন চলিয়া গেলে, বহুক্ষণ পর্যান্ত কাহারও কথা কহিবার  
প্রবৃত্তি রাহল না। রমা উঠিয়া যাহবার উপক্রম করিতে বেণী  
বলিয়া উঠিল,—“আপার জন্মে রমা ?” রমা মুচাক্সা হাসিল,  
কথা কহিল না। হাসি দেখিয়া বেণীর গা জলিয়া গেল, কহিল,  
—“শাল! ভৈরবের জন্তই এত কাণ্ড। আর তুমি না যাবে  
সেখানে, না ঠাকুর ছাড়িয়ে দেবে, এ সব কিছুই হ’ত না। তুমি  
ত হাসবেই রমা, মেয়েমানুষ, বাড়ান বার হ’তে ত হয় না, কিন্তু  
আমাদের উপায় কি হবে বল ত ? সত্যিই যদি একদিন আমার  
মাথাটা ফাটিয়ে দেয় ? মেয়েমানুষদের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই  
এই দশা হয়।” বলিয়া বেণী ভয়ে, ক্রোধে, জালায় মুখখানা কি  
একরকম করিয়া বসিয়া রহিল। রমা স্বান্তিত হইয়া রাহল।  
বেণীকে সে ভালমতেই চিনিত, কিন্তু, এত বড় নিলজ্জ অভিযোগ  
সে তাহার কাছেও প্রত্যাশা করিতে পারিত না। কোন উত্তর  
না দিয়া, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সে অন্তত চালায়া গেল।  
বেণী তখন হাঁক-ডাক করিয়া পোটা দুই আলো এবং ৫৬ জন  
লোক সঙ্গে করিয়া আশে-পাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ত্রস্ত ভীতপদে  
প্রস্থান করিল।

বিশেষরী ঘরে চুকিয়া অশ্রুভরা রোদনের কণ্ঠে শ্রবণ করিলেন,—  
—“আজ কেমন আছিন্ মা রমা ?” রমা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল,—“আজ ভাল আছি জ্যাঠাইমা ।”  
বিশেষরী তাঁহার শিরেরে আসিয়া বসিলেন এবং নিঃশব্দে মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন । আজ তিনমাসকাল বমা শয্যাগত । বুক জুড়িয়া কানি এবং মালেরিয়া বিষে সর্বদা সমাজের । গ্রামের প্রাচীন কবিরাজ প্রাণপণে ইহার বৃথা চিকিৎসা করিয়া মরিতেছে । সে বুড়া ত জানে না, কিসেব অবিশ্রাম আক্রমণে তাহার সমস্ত শ্রান্তিরা অহর্নিশি গুড়িয়া থাকে হইয়া যাইতেছে । সে বু বিশেষরীর মনেব মধ্যে একটা সংশয়ের ছায়া ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল । বমাকে তিনি কস্তার মতই স্নেহ করিতেন, সেখানে কোন কাঁক ছিল না ; তাই সেই অজান্তে স্নেহই বমার সংক্ষেপে তাঁহার সত্য-দৃষ্টিকে অসামান্যরূপে তীক্ষ্ণ করিয়া দিতেছিল । অপরে যখন ভুল বুঝিয়া, ভুল আশা করিয়া, ভুল ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তাঁহার তখন বুক ফাটিয়া বাইতে লাগিল । তিনি দেখিতেছিলেন, রমার চোখ ছোট গভীর কোটর-প্রবৃত্তি, কিন্তু দৃষ্টি অতিশয় তীব্র । যেন বহু বহু দূরের কিছু একটা অন্তস্ত কাছে করিয়া দেখিবার একাগ্র বাসনার একরূপ আলাধারণ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে । বিশেষরী ধীরে ধীরে ডাকিলেন,—  
“রমা ?”

“কেন জ্যাঠাইমা ?”

“আমি ত তোমার মায়ের বড় রমা—” রমা বাধা দিয়া বলিল,—  
“মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমিই ত আমার মা ।” বিশেষরী হেঁট হইয়া বমার লগাট চুষন করিয়া বলিলেন,—“তবে সত্যি ক’রে বস্ দেখি মা, তোমার কি হয়েছে ?”

“অনুধ করেছে জ্যাঠাইমা !” বিবেকবরী লক্ষ্য করিলেন, তাহার এমন পাণ্ডুর মুখখানি যেন পলকের জন্ম রাঙা হইয়া উঠিল। তখন গভীর স্নেহে তাহার গল্গ চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিলেন,—“সে ত এই ছোটো চামড়ার চোখেই দেখতে পাই না ! যা’ এতে ধরা যায় না, তেমন যদি কিছু থাকে, এ সময়ে আমার কাছে লুকোসনে রমা ! লুকোলে ত অনুধ সারবে না না ?” জানা-লার বাহিরে প্রভাত-রোদ্ৰ তখনও প্রথর হইয়া উঠে নাই এবং বৃহস্পতি নাতাসে শীতের আভাস দিতে ছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমা চুপ করিয়া রহিল। খানিকপরে কহিল—“বড়-দা’ কেমন আছেন, জ্যাঠাইমা ?” বিবেকবরী বলিলেন,—“ভাল আছেন ! মাথার বা’ সারুতে এখনও বিলম্ব হবে বটে, কিন্তু ৫৬ দিনের মধ্যে ইসপাতাল থেকে বাড়ী আসতে পারবে।” রমার মুখে বেদনার চিহ্ন অনুভব করিয়া বলিলেন,—“হুঃখ কোরো না মা, এই তাব প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে।” বলিয়া তিনি রমার মুখে বিশ্বাসের আভাস অনুভব করিয়া কহিলেন,—“ভাব্‌ট, মা হ’য়ে সম্বানের এত বড় দুর্ঘটনার এমন কথা কি করে বল্‌চি ? কিন্তু, তোমাকে সত্যি বল্‌চি মা, এতে আমি বাখা বেশী পেয়েচি, কি আনন্দ বেশী পেয়েচি, তা’ বল্‌তে পারিনে। কেন না, আমি জানি, যারা অর্থশ্রমে ভর করে না, লজ্জার ভয় যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশী থাকে, তা হ’লে সংসার ছার-থার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই কলুর ছেলে, বেশীত যে মঙ্গল ক’রে দিয়ে গেল, গৃথিবীতে কোন আত্মীয়বন্ধুই ওর সে ভাল করতে পারত না। কয়লাকে ধুয়ে তার রঙ বদলানো যায় না, মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।” রমা জিজ্ঞাসা করিল,—“বাড়ীতে তখন কি কেউ ছিল না ?” বিবেকবরী কহিলেন,—“থাক্‌বে না কেন, সবাই ছিল। কিন্তু, সে ত খামকা মেরে বসেনি, নিজে জ্বলে যাবে বলে ঠিক ক’রে, তবে,

তেল বেচতে এসেছিল। তার নিজের রাগ একটুও ছিল না, মা, তাই তার বাকের এক ঘারেই বেণী যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল,—আর আঘাত করলে না। তা' ছাড়া সে বলে গেছে, এর পরেও বেণী সাবধান না হ'লে, সে নিজে আর কখনো ফিরুক, না ফিরুক, এই মারই তার শেষ মার নয়।" রমা আস্তে আস্তে বলিল,—“তার নানে আরও লোক গিছনে আছে। কিন্তু, আমাদের দেশে ছোটলোকের এত সাহস ত কোন দিন ছিল না জ্যাঠাইমা, কোথা থেকে এ তারা পেলেন ?” বিবেচনার মুহূর্ত হাসিয়া কহিলেন,—“সে কি তুই নিজে জানিস্ নে, মা, কে দেশের এই ছোটলোকদের বুক এমন ক'রে ভরে দিয়ে গেছে ? আগুন মলে উঠে শুধু শুধু নেবে না রমা। তাকে জোর ক'বে নেবালেও সে আশপাশের জিনিষ ভাতিয়ে দিয়ে যার। সে আমার ফিরে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেখানে খুসি সেখানে যাক্ ; বেণীর কথা মনে ক'রে আমি কোন দিন দীর্ঘাশ ফেলব না।” কিন্তু, বলা সত্ত্বেও বিবেচনারী যে জোর করিয়াই একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলেন, রমা তাহা টের পাইল। তাই তাহার হাত-খানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল। একটুখানি গামলাইকা লইয়া বিবেচনারী পুনশ্চ কহিলেন,—“রমা, এক সম্ভান যোক, সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন তারা অট্টতস্ত অবস্থায় ধরাধার ক'বে পাড়িতে তুণে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হয়েছিল, সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারুব না। কিন্তু, তবুও আমি কারকে একটা অভিসম্পাত বা কোন লোককে আমি দোষ দিতে পর্যাস্ত পারিনি। এ কথা ত ভুলতে পারিনি, মা, যে, এক সম্ভান বলে ধর্ম্মের শাসন ত মায়ের মুখ চেয়ে চুপ করে থাকবে না।” রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল,—“তোমার সঙ্গে তর্ক কর্চেনে জ্যাঠাইমা ; কিন্তু, এই যদি হয়, তবে, রমেশ-দা' কোন পাপে এ দুঃখভোগ কর্চেন ? আমরা যা'

ক'রে তাঁকে জেলে পুরে দিয়ে এসেছি, সে ত কারো কাছেই চাপা নেই।" জ্যাঠাইমা বলিলেন,—“না, মা, তা' নেই। নেই বলেই বেগী আজ হাঁসপাতালে। আর তোমার—” বলিয়া তিনি সহসা ধামিয়া গেলেন। যে কথা তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িল, তাহা জোর করিয়া তিতরে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন,—“কি জানিস্ মা, কোন কাজই কোন দিন শুধু শুধু শুল্লে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও-না-কোথাও গিয়ে কাজ করেই। কিন্তু, কি ধোরে করে, তা' সকল সময়ে ধরা পড়ে না বলেই আজ পর্যন্ত এ সমস্তার মীমাংসা হ'তে পারলে না, কেন একজনের পাপে আর একজন প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু, কবুতে যে হয় রমা, তাতে ত লেশমাত্র সন্দেহ নাই।” রমা নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া নারকে নিশ্বাস ফেলিল। বিস্ময়বানী বলিতে লাগিলেন,—“এর থেকে আমারও চোখ দুটেচে রমা, ভাল করণ বললেই ভাল করা যায় না। গোড়ার অনেকগুলো ছোটবড় সিঁড় উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস থাকা চাই। একদিন রমেশ হত্যা হয় আমাকে বন্ধুতে এসেছিল, ‘জ্যাঠাইমা, আমার কাজ নেই এদের ভাল ক'রে, আমি যেখান থেকে এসেছি, সেইখানেই চ'লে যাই।’ তখন আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, ‘না রমেশ, কাজ যদি সুর করেচিস বাবা, তবে ছেড়ে দিয়ে পালাসনে।’ আমার কথা সে ত কখনো চেনতে পারে না; তাই, যে দিন তার জেলের হুকুম শুনতে পেলাম, সে দিন মনে হ'ল, ঠিক যেন আমিহ তাকে ধরে-বেঁধে এহ শাস্ত দিলাম। কিন্তু, তার পর বেগীকে যে দিন হাঁসপাতালে নিয়ে গেল, সে দিন প্রথম টের পেলাম,—না, না, তারও জেল খাটবার প্রয়োজন ছিল। তা' ছাড়া ত জানিন মা, বাহরে থেকে ছুটে এসে ভাল করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত,—সে কাজ এমন কঠিন! আগে যে মিলুতে হয়, সকলের সঙ্গে ভালতে-মনতে এক না হ'তে পারলে যে কিছুতেই ভাল করা যায় না—সে কথা

ত মনেও তাবিনি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার, স্বভাব, মত্ত প্রাণ নিয়ে এতই উচুতে এসে দাঁড়াল যে, শেষ পর্যন্ত কেউ তার নাগালই পেলো না। কিন্তু, সে ত আমার চোখে পড়ল না মা, আমি তাকে যেতেও দিলাম না, রাব্তেও পারলাম না।” রমা কি একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। বিবেচনায় তাহা অসম্মান করিয়া কহিলেন,—“না রমা, অশ্রুতাপ আমি সে ক্ষম্য করিনে। কিন্তু, তুইও শুনে রাগ করিস্নে মা,—এইবার তাকে তোরা নাবিয়ে এনে সকলের সঙ্গে যে মিলিয়ে দিলি, তাতে তোদের অর্থশ্রম যতই বড় হোক, সে কিন্তু ফিরে এসে এবার যে ঠিক সত্যটির দেখা পাবে, এ কথা আমি বড় গলা করেই ব’লে যাচ্ছি।” রমা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া কহিল,—“কিন্তু, এতে তিনি কেন নেবে যাবেন জ্যাঠাইমা? আমাদের অস্বাভাবিক ফলে গত বড় ষাটনাই তাঁকে ভোগ ক’রতে হোক, আমাদের দুঃস্বপ্ন আমাদেরই নরকের অন্ধকূপে ঠেলে দেবে, তাঁকে স্পর্শ ক’রবে কেন?” বিবেচনায় হীনভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন,—“করবে বই কি মা; নইলে পাপ আর এত ভয়ঙ্কর কেন? উপকারের প্রতাপ-কার কেউ বান নাই করে, এমন কি, উল্টো অপকারই করে, তাতেই বা কি এসে যায় মা, যদি না তার কৃতঘ্নতার দাতাকে নাবিয়ে আনে! তুই বল্চিস্ মা, কিন্তু, তোদের কঁরাপুর রমেশকে কি আর তেমনিটি পাবে? সে ফিরে এলে তোরা স্পষ্ট দেখতে পাবি, সে, যে হাত দিয়ে দান ক’রে বেড়াতো, ভৈরব তার সেই ডানহাতটাই মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েচে।” তার পর একটু খামিয়া নিজেই বলিলেন,—“কিন্তু, কে জানে! হয় ত ভালই হয়েছে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপরিণীত দান গ্রহণ করবার শক্তি যখন গ্রামের লোকের ছিল না, তখন এই ভাঙা হাতটাই বোধ করি এবার তাদের সত্যকার কাজে লাগবে।” বলিয়া তিনি গভীর একটা নিখাস মোচন করিলেন। তাহার হাতখানি রমা



কথাটি আমার হ'লে তাঁকে বোলা জ্যাঠাইমা, বত মন্দ ব'লে  
আমাকে তিনি জানিতেন, তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর বত  
দুঃখ তাঁকে দিবেচি, তার অনেক বেশী দুঃখ যে আমিও পেয়েচি,—  
তোমার মুখের এই কথাটি হ'লে ত'নি অবিশ্বাস করবেন না।”  
বিশেষরী উপড় হইয়া পড়িয়া, বুক দিয়া রমাকে চাপিয়া ধরিয়া  
কাদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, “চলু মা, আমরা কোন ভীর্থে  
গিয়ে থাকি! যেখানে বেগী নেই, রমেশ নেই—যেখানে চোখ  
তুললেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে—সেইখানে যাই।  
আমি সব বৃত্তে পেরেচি রমা। যদি বাবার দিনই তোর এগিয়ে  
এসে থাকে, মা, তবে এ বিষ বৃকে পূরে জলে পুড়ে সেখানে গেলে  
ত চলবে না। আমরা বাবুনের মেয়ে, সেখানে বাবার দিনটিতে  
আমাদের তার মতই গিয়ে উপস্থিত হ'তে হবে।” রমা অনেকক্ষণ  
চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া, একটা উজ্জ্বল দীপ্যাস আলোক  
করিতে করিতে শুধু কহিল,—“আমিও তেমনি করেই যেতে চাই  
জ্যাঠাইমা।”

১৮

কারাগারটার বাহিরেই যে তাহার সমস্ত দুঃখ ভগবান এমন  
করিয়া সার্থক করিয়া দিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন,  
ইহা বোধ করি রমেশের উন্নত-বিকারেও আশা করা তাহার পক্ষে  
সম্ভবপর ছিল না। ছরমাস সপ্তম অবরোধের পর মুক্তিলাভ  
করিয়া সে জেলের বাহিরে পা দিয়াই দেখিল, আচক্ষ্যানীর ব্যাপার।  
স্বয়ং বেশী ঘোষাল মাথার চাঁদর জড়াইয়া সর্কাগ্রে দণ্ডমান।  
তাহার পক্ষাতে উত্তর বিভাগের সাতার, পণ্ডিত ও ছাত্রের দল  
এবং কয়েক জন হিন্দু-মুসলমান প্রজা। বেগী সজোরে আলিঙ্গন  
করিয়া কাদ কাদ গলায় কহিল,—“রমেশ, তাহারে, নাড়ীর টান  
বে এখন টান এবার তা' টের পেরেছি। বহু দুখবার মেয়ে যে

আচাষি হারামজাদাকে হাত ক'রে, এমন শক্ততা ক'রবে, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে-সাক্ষী দিয়ে এত চুপ দেবে, সে কথা জেনেও যে আমি তখন জানতে চাইনি, ভগবান তার শাস্তি আমাকে ভালমতেই দিয়েছেন। জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি ভাল রমেশ, বাইরে এই ছ'টা মাস আমি যে তুষের আশুনে জলে-পুড়ে গেছি!" রমেশ কি করিবে, কি বলিবে, ভাবিয়া না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। হেডমাষ্টার পাড়ুই মহাশয় একেবারে ভুলুপ্তিত হইয়া রমেশের পায়ের ধূলা মাখায় লইলেন। তাহার পিছনের দলটি তখন অগ্রসর হইয়া কেহ আশীর্বাদ, কেহ সেলাম, কেহ প্রণাম করিবার ঘটার সমস্ত পথটা যেন চবিয়া ফেলিতে লাগিল। বেণীর কান্না আর মানা মানিল না। অশ্রু-গদগদকণ্ঠে কহিল,—“দাদার উপর অভিমান রাখিস্নে, তাই বাড়ী চল। মা কোঁদে কোঁদে ছ'চক্ষু অন্ধ করবার যোগাড় করেচেন।” খোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল; রমেশ বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাতে চড়িয়া বসিল। বেণী সম্মুখের আসনে স্থানগ্রহণ করিয়া মাথার চাদর খুলিয়া ফেলিল। বা শুকাইয়া গেলেও আঘাতের চিহ্ন জ্বলমান। রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—“ও কি বড়দা?” বেণী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ডান হাত উন্টাইয়া কহিল,—“কাকে আর দোষ দেব তাই, এ আমার নিজেরই কর্ম্মকল—আমারই পাগের শাস্তি! কিন্তু, সে আর শুনে কি হবে?” বলিয়া মুখের উপর গভীর বেদনার আভাস ফুটাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার নিজের মুখের এই সরল স্বীকারোক্তিতে রমেশের চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল। সে মনে করিল, কিছু একটা হইয়াছেই। তাই, সে কথা শুনিবার জন্ত আর পীড়াপীড়ি করিল না। কিন্তু, বেণী যে জন্ত এই ভূমিকাটি করিল, তাহা ফাঁসিয়া বাইতেছে দেখিয়া সে নিজেই মনে মনে ছটকট করিতে লাগিল। মিনিট দুই নিঃশব্দে কাটার পরে, সে আবার একটা প্রবল নিশ্বাসের দ্বারা রমেশের

মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—“আমার এই একটা জন্মগত দোষ যে, কিছুতেই মনে এক, যুখে আর কর্তৃত্ব পারিনে। মনের ভাব আর পাঁচজনের মত ঢেকে রাখতে পারিনি বলে, কত শাস্তিই যে, ভোগ করতে হয়, কিন্তু, তবু ত আমার চৈতন্ত হল না!” রমেশ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া, বেণী কর্ণধর আরও মৃদু ও গভীর করিয়া কহিতে লাগিল,—“আমার দোষের মধ্যে সে দিন মনের কষ্ট আর চাপতে না পেরে কীদূতে কীদূতে বলে ফেলেছিলাম, রমা, আমরা তোর এমন কি অপরাধ করেছিলাম যে, এই বর্জন্য আমাদেব করলি! জেল হয়েছে শুনলে যে, মা একেবারে প্রাণ-বিসর্জন করতেন। আমরা ভায়ে ভায়ে বিষয় নিয়ে ঝগড়া করি—মা’ করি, কিন্তু, তবু ত সে আমার ভাই! তুই একটি আঘাতে আমার ভাইকে মারলি, মাকে মারলি! কিন্তু, নির্দোষীর ভগবান আছেন।” বলিয়া সে গাড়ীর বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া আর একবার ধেন নালাশ জানাইল। রমেশ যদিও এ অভিযোগে যোগ দিল না, কিন্তু, মন দিয়া শুনিতে লাগিল। বেণী একটু থামিয়া কহিল,—“রমেশ, আমার সে উগ্রমূর্তি মনে হ’লে এখনো জ্বংকল্প হয়, দাঁতে দাঁতে ঘ’সে বললে ‘রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে বায় নি? পায়ে ছেড়ে দিত বুঝি?’” মেঘেমাঝের এত দর্প আবহু হয় না রমেশ। আমিও বেগে ব’লে ফেললাম, “আজ্ঞা কিরে আমুক সে, তার পরে এর বিচার হবে!” এতক্ষণ পর্যন্ত রমেশ বেণীর কথাগুলো মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। কবে তাহার পিতা রমার পিতাকে জেলে দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা সে জানে না; কিন্তু, ঠিক এই কথাটিই সে দেশে পা-দিয়াই রমার মাসীর যুখে শুনিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। তখন পরের ঘটনা শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হঠখা উঠিল। বেণী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল,—“ধন করা

তার অভ্যাস আছে ত! আত্মবর লেঠলকে পাঠিয়েছিল, মনে নেই? কিন্তু, তোমাব কাছে ত চালাকি খাটেনি,—বরঞ্চ তুমিই উশটে শিংঘরে দিগোচলে। কিন্তু, আমাকে দেখে ত? এই কী-পদ্মা! “বলিছা বেণী একটুখানি চিন্তা করিয়া লইয়া, তুই কলুব ছেলেও করিত ‘ববব’ নিজের অন্ধকার অন্তরের ভিতর হইতে বাহ্যিক বস্তু আপনাব ভাষা একটু একটু গ্রহণ কবিয়া বিবৃত কবিল। বমেশ রূপানিগ্রাসে কহিল,—‘তাব পর?’ বেণী মলিনমুখে একটুখানি হাসিয়া কহিল,—‘তাব পরে কি আর মনে আছে তাই! কে, কিলে কবে যে আমাকে কাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, দেখানে কি হ’ল, কে দেখে, কিছুই জানিনে। দশদিন পবে জ্ঞান হ’রে দেখলান, হাসপাতালে প’ড়ে আছি। এ যাত্রা যে রকমে স্বেচ্ছাচিন্তে কেবলি মামের পুণ্য—গমন মা কি আর আছে রমেশ!” রমেশ একটি কথাও বহুতে পারিল না—কাঠের মূর্তির মত শক্ত হইয়া বসিয়া বসিল। শুধু কেবল গ্রাহার দল অঙ্গুলি জড় হইয়া বধু-কর্তন মনায় পরিণত হইল। তাহার মাথায় ক্রোধ ও ঘৃণা যে জীর্ণ বস্ত্র-দ্রব্যাতে লাগিল, তাহার পারমাণ কান্নাবারও তাহার সাধ্য রাখিল না। বেণী যে কত মল্ল, তাহা সে জানিত। তাহার অসঙ্গী যে কিছুই নাই, ওহাও তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু, সংসাবে কোনো মানুষই যে এত অসত্য এমন অসঙ্কোচে, একপ জনগল উচ্চারণ করিয়া যাঠিতে পারে, তাহা কল্পনা করিবার মত অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। তাই, সে রমার সমস্ত অপরাধই সভ্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

সে দেশে ফিরিয়া আসায় গ্রামময় যেন একটা উৎসব ব্যাধিয়া গেল। প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং রাত্রি পর্যন্ত এত জনসমাগম, এত কথা, এত আত্মীয়তার ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল যে, কারাবাসের যেটুকু মানি তাহার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, দেখিতে দেখিতে কোথা উড়িয়া গেল। তাহার অবর্তমানে গ্রামের মধ্যে যে খুব বড় একটা

সমাজিক স্রোত ফিরিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু, এই কয়টা মাসের মধ্যেই এত বড় পরিবর্তন কেমন করিয়া সম্ভব হইল, ভাবিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, বেণীর প্রতিকূলতার যে শক্তি পদে পদে প্রতিহত হইয়া কাজ করিতে পারিতেছিল না, অথচ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই এখন তাহারি অল্পকূলতার দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বেণীকে সে আজ আরও একটু ভাল করিয়া চিনিল। এই লোকটাকে এরূপ অনিষ্টকারী জানিয়াও সমস্ত গ্রামের লোক যে, তাহার কতদূর বাধ্য, তাহা আজ যেমন সে দেখিতে পাইল, এমন কোন দিন নয়। ইহারই বিরোধ হইতে পরিমাণ পাইয়া রমেশ মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শুধু তাই নয়, রমেশের উপর অত্যন্ত অত্যাচারের স্বস্তি গ্রামের সকলেই মর্শ্বাহত, সেকথা একে-একে সবাই তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে। ইহাদের সমবেত-সহায়ত্ব লাভ করিয়া, এবং বেণীকে স্বপক্ষে পাইয়া, আনন্দে, উৎসাহে হৃদয় তাহার বিস্তারিত হইয়া উঠিল। ছয়মাস পূর্বে যে সকল কাজ আরম্ভ করিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, আবার পুরাদনে তাহাতে লাগিয়া পড়িবে সম্ভব করিয়া রমেশ কিছুদিনের স্বস্তি নিজেও এই সকল আমোদ-আহ্লাসে গা ঢালিয়া দিয়া, সর্বত্র, ছোট-বড় সকল বাড়ীতে, সকলের কাছে, সকল বিষয়ের খোজখবর লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। শুধু একটা বিষয় হইতে সে সর্বপ্রথমে নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিতেছিল,—তাহা রমার প্রসঙ্গ। সে পীড়িতা, তাহা পথেই শুনিয়াছিল; কিন্তু, সে পীড়া যে এখন কোথায় উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহার কোন সংবাদ গ্রহণ করিতে চাহে নাই। তাহার সমস্ত সম্বন্ধ হইতে আপনাকে সে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, ইহাই তাহার ধারণা। গ্রামে আসিয়াই মুখে মুখে শুনিয়াছিল, শুধু একা রমাই যে, তাহার সমস্ত হৃৎকের মূল, তাহা সবাই জানে। সুতরাং এইখানে বেণী যে মিথ্যা কথা কহে নাই, তাহাতে আর তাহার সন্দেহ

রহিল না ! দিন পাঁচছয় পরে বেণী আসিয়া রমেশকে চাপিয়া ধরিল । শীতপরের একটা বড় বিষয়ের অংশ-বিভাগ হইয়া বহুদিন হইতে রমার সহিত তাহার প্রচুর মনোবিবাদ ছিল । এই সুযোগে সেটা স্তম্ভগত করিয়া লওয়া তাহার উদ্দেশ্য । বেণী বাহিরে বাহাই শব্দক সে মনে মনে রমাকে ভয় করিত । এখন সে শয়ানগত, নামলা-মকদ্দমা কবিতা পারিবে না ; উপরন্তু তাহাদেব মুসলমান প্রত্যাশাও রমেশের কথা চৈলিতে পারিবে না । পরে বাই হোক, আপাততঃ বেদশাস্ত্র করিবার এমন অবসর আর মিলাবে না, বলিয়া সে একেবারে অস্থির হইয়া বসিল । রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া অস্বীকার করিতেই, বেণী বড় প্রকারের নৃক্তিপ্রয়োগ করিয়া শেষে কহিল,—

—“হবে না কেন ? বাগে গেবে সে কবে তোমাকে বেয়াং কথ্যেতে যে, তার অস্থখের কথা তুমি ভাবতে বাচ্ছ ? তোমাকে যখন সে অলে দিয়েছিল, তখন তোমার অস্থখই বা কোন্ কন্ম ছিল তাই !” কথাটা সত্য । রমেশ অস্বীকার করিতে পারিল না । “হু, কেন যে তোমার মন কিছুতেই তাহার বিপক্ষতা করিতে চাহিল না, বেণীর সহস্র বড় উদ্বেজনা সত্ত্বেও রমার অসহায়, পীড়িত অন্তা মনে করিতেই তাহার সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গেল, তাহার সৃষ্টি হেতু সে নিজেও খুঁজিয়া পাইল না । রমেশ চুপ করিয়া রহিল । বেণী, কাজ হইতেছে জানিলে, থৈকা ধরিতে জানে । সে তখনকার মত আর পীড়াপীড়ি না করিয়া, চলিয়া গেল ।

এবার আর একটা জিনিস রমেশের বড় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । বিশেষরূপে কোন দিনই সংসারে যে বিশেষ আসক্তি ছিল না, তাহা সে পূর্বেও জানিত ; কিন্তু, এবার কিরিয়া আসিয়া সেই অনাসক্তিটা যেন বিতৃষ্ণার পরিণত হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল । কারাগার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বেণীক সমজিব্যাহারে যে দিন সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দিন

বিশেষরী আনন্দ-প্রকাশ করিয়াছিলেন, সঙ্কল-কণ্ঠে বারংবার অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তথাপি কি-ধেন-একটা তাহাতে ছিল, বাহাতে সে বাধাই পাইয়াছিল। আজ হঠাৎ কথার কথার শুনিল,—বিশেষরী কানী-বাস-সঙ্কল করিয়া খাতা করিতেছেন, আর ফিরিবেন না। শুনিয়া সে চমকিয়া গেল। কৈ, সে ত কিছুই জানে না! নানাকাঙ্গে পাঁচছয় দিনের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; কিন্তু, যে দিন হইয়াছিল, সে দিন ত তিনি কোন কথা বলেন নাই। যদিচ সে জানিত, তিনি নিজে হইতে আপনাব বা পরের কথা আলোচনা করিতে কোন দিন ভালবাসেন না, কিন্তু, আজকের সংবাদটার সহিত সে দিনের স্মৃতিটা পাশাপাশি চোখের সাম্মনে তুলিয়া ধরিনামাত্র তাঁহার এই একান্ত বৈরাগ্যের অর্থ দেখিতে পাইল। আর তাহার লেশমাত্র সংশয় রহিল না, জ্যাঠাইমা সত্যটি বিদ্যস্ত লইতেছেন! এ যে কি, তাঁহার অবিদ্যমানতা যে কি অভাব, মনে করিতেই তাহার হৃৎ চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন ন'টা দশটা। ঘবে ঢুকিতে গিয়া দাসী জানাইল, তিনি মৃণ্মুখে-বাড়ী গেছেন। রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল,—“এমন অসময়ে যে?”

এই দাসীটি বহুদিনের পুরাণো। সে যুগ হাসিয়া কহিল,—“না'র আবার সময় অসময়! তা' ছাড়া আজ তাঁদের ছোটবাবুর পৈতে কি না।” দত্তীনের উপনয়ন? রমেশ আরও আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—“কৈ, এ কথা ত কেউ জানে না!” দাসী কহিল,—“তাঁরা কাউকে বলেননি। বল্লেও ত কেউ গিয়ে পাবে না—রমাদিককে কর্ত্তারা সব ‘একঘরে’ ক'রে রেখেছেন কি না!” রমেশের বিষয়ের অবধি রহিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই, দাসী সলজ্জ ষাট্টা কিয়াইয়া বলিল,—“কি জানি ছোটবাবু—রমাদিকের কি সব বিত্তী অখ্যাতি

বেরিয়েচে কি না—আমরা গরীব-দুঃখী মানুষ, সে সব জানিনে ছোটবাবু—” বলিতে বলিতে সে সরিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া রমেশ গৃহে ফিরিয়া আসিল। এ যে বেগীর ক্লেশ প্রতিশোধ, তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াও সে বুঝিল। কিন্তু, ক্রোধ কি জ্ঞান, এবং কিসের প্রতিহিংসা কামনা করিয়া সে কোন্ বিশেষ কদম্বা ধারায় রম্যর অধ্যাতিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, এ সকল ঠিক মত অনুমান করাও তাহার স্বারা সম্ভব ছিল না।

১৯

সেই দিন অপরাহ্নে একটা অচিন্ত্যনীয় ঘটনা ঘটিল। আদালতের বিচার উপেক্ষা করিয়া কৈলাস নাপিত এবং সেখ নতিলাল শাক্তীসাবুদ সঙ্গে লইয়া রমেশের শরণাপন্ন হইল। রমেশ অক্লিম বিশ্বস্তের সাতত প্রশ্ন করিল,—“আমাব বিচার তোমরা মান্বে কেন বাপু?”

বাদী প্রতিবাদী উভয়েই জবাব দিল,—“মান্বে না কেন বাবু, হাকিমের চেয়ে আপনার নিষ্ঠাবুদ্ধিই কোন্ কুম? আর, হাকিম-হুজুর বা’ কিছু তা’ আপনারা পাঁচজন ভ্রাতৃলোকেই ত হ’রে থাকেন। কা’ল যদি আপনি সরকারী চাকরি নিয়ে হাকিম হ’য়ে ব’লে বিচার ক’রে দেন, সেই বিচার ত আমাদেরই মাথা পেতে মিতে হবে। তখন ত মান্বে না, বল্লে চল্বে না।” কথা শুনিয়া রমেশের দুক গর্কে, আনন্দে ক্ষীত হইয়া উঠিল। কৈলাস কহিল,—“আপনাকে আমরা ছদ্মনেই হ’কথা বুঝিয়ে বলতে পারব; কিন্তু, আদালতে সেটি হবে না। তা’ ছাড়া গাঁটের কড়ি মৃত্যোঙ্করে উকিলকে না মিতে পারলে, সুবিধে কিছুতেই হয় না, বাবু। এখানে একটা প্রশ্না খরচ নেই, উকিলকে খোসামোদ করিতে হবে না, পথ ঠাঁটাইটি ক’রে মরতে হবে না। না বাবু, আপনি যা’ ছেকুম করবেন, ভাল হোক, মন্দ হোক, আমরা তাতেই রাজী



হ'য়ে, আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে, ঘরে ফিরে যাব। ভগবান্ সুবুদ্ধি দিলেন, আমরা দুজনে তাই আদালত থেকে ফিরে এসে আপনার চরণেই শরণ নিলাম।" একটা ছোট্টা নালা হইয়া উভয়ের বিবাদ। দলিলপত্র সামান্য যাহা কিছু ছিল, রমেশের হাতে দিয়া কা'ল সকালে আসিবে বলিয়া, উভয়ে লোকজন লইয়া প্রস্থান করিবার পর, রমেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ইহা তাহার কল্পনার অতীত। সুদূর-ভবিষ্যতেও সে কখনও এত রক্ত আশা মনে ঠাই দেয় নাই। তাহার মীমাংসা ইহার পরে গ্রহণ করুক বা না করুক, কিন্তু, আজ যে, ইহার সরকারী আদালতের বাহিরে বিবাদনিষ্পত্ত করিবার অভিপ্রায়ে পথ হইতে ফিরিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই তাহার বুক ভরিয়া আনন্দ-স্রোত ছুটাইয়া দিল। যদিচ, বেশী কিছু নয়, সামান্য দুইজন গ্রামবাসীর অতি তুচ্ছ বিবাদের কথা; কিন্তু, এই তুচ্ছ কথার সূত্র ধরিয়াই তাহার চিন্তের মাঝে অনন্ত সম্ভাবনার আকাশ-কুসুম ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার এই দুর্ভাগিনী জন্মভূমির অল্প ভবিষ্যতে সে কি যে না করিতে পারিবে, তাহার কোথাও কোনো হিসাব-নিকাশ, কুলাকিনারা আর রহিল না। বাহিরের বসন্ত-জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া বাইতছিল, সেই দিকে চাহিয়া হঠাৎ তাহার রমাকে মনে পড়িল। অল্প কোন দিন হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সর্বাপ জালা করিয়া উঠিত। কিন্তু, আজ জালা করা ত দুয়ের কথা কোথাও সে একবিন্দু অগ্নি-ফুলিঙ্গের অস্তিত্বও অনুভব করিল না। মনে মনে একটু হাসিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—“তোমার হাত দিবে ভগবান্ আমাকে এমন সার্থক ক'রে তুলবেন, তোমার বিষ আমার অদৃষ্টে এমন ক্ষয় হ'য়ে উঠুক, এ যদি তুমি জানতে রহা, বোধ করি, কখনও আমাকে জেলে দিতে চাইতে না। কে গা?”

“আমি রাখা, ছোটবাবু। রমাদিদি অতি অবিভ্র ক'রে

একবার দেখা দিতে বলছেন।” রমা সাক্ষাৎ করিবার জন্য দাসী পাঠাইয়া দিয়াছে। রমেশ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। আজ এ কোন্ নষ্টবুদ্ধি দেবতা তাহার সহিত সকল প্রকারের অনাস্থি কৌতুক করিতেছেন। দাসী কহিল,—“একবার দয়া ক’রে যদি ছোটবাবু—” “কোথায় তিনি?”

“বরে ভয়ে আছেন।” একটু থামিয়া কহিল,—“কাল ত আর সময় হ’য়ে উঠবে না, তাই, এখন যদি একবার—” “মাছা চল বাই—” বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া রমা একপ্রকার সচকিত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়াছিল। দাসীও নির্দেশমত রমেশ ঘরে ঢুকিয়া, একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিতেই, সে শুদ্ধমাত্র যেন মনের জোরেই নিজেকে টানিয়া আনিয়া রমেশের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল। ঘরের এককোণে মিটমিট কবিয়া একটা পদ্মীপ জ্বলিতেছিল; তাহারি মৃদু আলোকে রমেশ অস্পষ্ট-আকারে রমার বস্তুকু দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহার শারীরিক অবস্থার কিছুই জানিতে পাবিল না। এইমাত্র পণে আসিতে আসিতে সে যে সকল সম্বন্ধ মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, রমার সম্মুখে বসিয়া তাহার আগাগোড়াই বেঠিক হইয়া গেল। একটুখানি চুপ কবিয়া থাকিয়া সে কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—“এখন কেমন আছ রানী?” রমা তাহার পারের গোড়া হইতে একটুখানি সরিয়া বসিয়া কহিল,—“আমাকে আপনি রমা বলেই ডাকবেন।” রমেশের পিঠে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। সে একমুহূর্তেই কঠিন হইয়া কহিল,—“বেশ, তাই। শুনেছিলাম, তুমি অস্থূল ছিলে—এখন কেমন আছ, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। নইলে, নাম তোমার সাই হোক, সে ধ’রে ডাকবার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও হবে না।” রমা সমস্ত বৃথিল। একটুখানি স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—“এখন আমি ভাল আছি।” তারপরে কহিল,—“আমি

ডেকে পাঠিয়েছি ব'লে আপনি হয় ত খুব আশ্চর্য্য হয়েচেন, কিন্তু —” রমেশ কথার মাঝখানেই তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল,—“না, হইনি। তোমার কোনো কাজে আশ্চর্য্য হবার দিন আমার কেটে গেছে। কিন্তু, ডেকে পাঠিয়েছ কেন?” কথাটা রমার বৃকে যে কতবড় শেলাঘাত করিল, তাহা রমেশ জানিতে পারিল না। সে মৌননতমুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল,—“রমেশ দা’, আজ ছ’টি কাজের জন্তে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেছি। আমি তোমার কাছে কত অপরাধ যে ক’রেছি, সে ত আমি জানি। কিন্তু, তবু আমি নিশ্চয় জান্তাম, তুমি আসবে, আর আমার এই ছ’টি শেষ অনুরোধও অস্বীকার করবে না।” অশ্রুভারে সহসা তাহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। তাহা এতই স্পষ্ট যে, রমেশ-টের পাইল, এবং চক্ষের নিম্নে তাহার পূর্ব্বস্নেহ আলোড়িত হইয়া উঠিল। এত আঘাত-প্রতিঘাতেও সে রেহা যে আজিও মরে নাই, শুধু নিঃজীব, অচেতনের মত পড়িয়াছিল মাত্র, তাহা নিশ্চিত অন্ততঃ ব করিয়া সে নিজেও আজ বিস্মিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিল,—“কি তোমার অনুরোধ?” রমা চকিতের মত মুখ তুলিয়াই আবার অবনত করিল। কহিল,—“যে বিষয়টা বড়দা’ তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্ছেন, সেটা আমার নিজের; অর্থাৎ আমার পোনের আনা, তোমাদের এক আনা, সেইটাই আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই।” রমেশ পুনর্বার উচ্চ হইয়া উঠিল। কহিল,—“তোমার ভয় নেই, আমি চুরি করতে পূর্ব্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো করব না। আর যদি দান করিতেই চাও—তার জন্তে অস্ত্র লোক আছে—আমি দান-গ্রহণ করিনে।” পূর্ব্ব হইলে রমা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিত, “মুখ্যোদ্দেশ্যে দান-গ্রহণ করায় ঘোষালদের অপমান হয় না।” আজ কিন্তু, এ কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে বিনীতভাবে কহিল,—“আমি জানি, রমেশ দা’, তুমি চুরি করতে সাহায্য

করবে না। আর নিলেও যে তুমি নিজের জন্তে নেবে না, সেও আমি জানি। কিন্তু, ভা'ও নয়। দোষ করলে শাস্তি হইবে। আমি বড় অপরাধ করেছি, এটা তারই জরিমানা বলে ঠেকান গ্রহণ কর না।” রমেশ কলকাল মৌন থাকিয়া কহিল,—“তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?” রমা কহিল,—“আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তাকে তোমার মত ক’রে মানুষ কোরো। বড় হ’লে সে যেন তোমার মতই হাসিমুখে স্বার্থত্যাগ করতে পারে।” রমেশের চিন্তের সমস্ত কঠোরতা বিগলিত হইয়া গেল। রমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল,—“এ আমার চোখে দেখে যাবার সময় হবে না; কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, যতীনের দেহে তার পূর্বপুরুষের রক্ত আছে। ত্যাগ করবার যে শক্তি তার অস্থিমজ্জায় মিশিয়ে আছে—শেখালে হয় ত একদিন সে তোমার মতই মাথা উঁচু ক’রে দাঁড়াবে।” রমেশ তৎক্ষণাৎ তাহার কোন উত্তর দিল না। জানালার বাহিরে জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের ভিতরটা এমন একটা ব্যাথায় ভরিয়া উঠিতেছিল, যাহার সহিত কোনদিন তাহার পরিচয় ঘটে নাই। বহুকণ নিঃশব্দে কাটার পরে, রমেশ মুখ ফিরাইয়া কহিল,—“দেখ, এ সবলের মধ্যে আর আমাকে টেনো না। আমি অনেক দুঃখ-কষ্টের পর, একটুখানি আলোর শিখা আলতে পেরেছি;—তাই আমার কেবল ভয়, পাছে একটুতেই তা’ নিবে যায়।” রমা কহিল,—“আর ভয় নেই রমেশ দা’, তোমার এ আলো আর নিব্বে না। জাঠাইমা বলছিলেন, তুমি দূর থেকে এসে বড় উচুতে ব’সে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধা-বিষ পেরেচ। আমরা নিজেদের দুষ্কৃতির ভারে তোমাকে নাবিরে এনে এখন ঠিক জায়গাটিতেই প্রতিষ্ঠিত ক’রে দিই। এখন তুমি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচ বলেই তোমার ভয় হচ্ছে; আগে ছিলে এ আশঙ্কা তোমার মনেও ঠাই পেত না। এখন তুমি গ্রাম্য-সমাজের

অতীত ছিলে, আজ তুমি তারই একজন হয়েচ। তাই এ আলো তোমার আর রান্না হবে না—এখন প্রতিদিনই উজ্জল হ'য়ে উঠবে। সহসা জ্যাঠাইমার নামে রমেশ উদ্যত হইয়া উঠিল—কহিল,—“ঠিক জানো কি রমা, আমার এই দীপের শিখাটুকু আর নিবে যাবে না?” রমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—“ঠিক জানি। যিনি সব জানেন, এ সেই জ্যাঠাইমার কথা। এ কাজ তোমারি। আমার বতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আজ আশীর্বাদ ক'রে আমাকে বিদায় দাও রমেশদা। আমি যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমার স্বামীর কাছে যেতে পারি।” বজ্রগর্ভ মেঘের মত রমেশের বকের ভিতরটা ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু, সে মাথা হেঁট করিয়া শুকু হইয়া বসিয়া রহিল। রমা কহিল,—“আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বল রাখবে?” রমেশ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—“কি কথা?” রমা বলিল,—“আমার কথা নিয়ে বড়দা'র সঙ্গে তুমি কোন দিন ঝগড়া কোরো না।” রমেশ বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল—“তার মানে?” রমা কহিল,—“মানে যদি কখনও গুলতে পাও, সেদিন শুধু এই কথাটি মনে করো, আমি কেমন ক'রে নিশকে সহ্য ক'রে চলে গেছি,—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। একদিন বধন অসহ্য মনে হয়েছিল, সে দিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন,—‘মা, মিথ্যাকে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে আগ্নেয়ে তুললেই তার পরমায়ু বেড়ে ওঠে।’ নিজের অসহিষ্ণুতার তার আঁখি বাড়িয়ে তোলার মত পাপ আরই আছে।’ তার এই উপদেশটি মনে রেখে, আমি সকল দুঃখ ভ্রান্তিগায় কাটিয়ে উঠেচি—এটি ভূমিও কোন দিন ভুলো না, রমেশদা।” রমেশ নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমা ক্রমেক পরে কহিল,—“আজ আশীর্বাদে তুমি ক্ষমা ক'রতে প্রস্তুত না মনে ক'রে দুঃখ কোরো না, রমেশদা। আমি নিশ্চয় আমি, আজ বা' কঠিন বলি মনে হ'লে, একদিন তাই সোজা হ'য়ে যাবে।

সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি সহজেই ক্ষমা করবে জেনে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্লেশ নেই। কা'ল আমি যাচ্ছি।”

“কা'ল ?” রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কোথায় যাবে কা'ল ?” রমা কহিল,—“জ্যাঠাইমা যেখানে নিজে যাবেন, আমি সেইখানেই যাব।” রমেশ কহিল,—“কিন্তু, তিনি ত আন ফিরে আসবেন না স্তনুচি।” রমা ধীরে ধীরে বলিল,—“আমিও না। আমিও তোমাদের পায়ে জন্মের মত বিদায় নিচ্ছি। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইল। রমেশ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া লাড়াইয়া কহিল,—“আচ্ছা, নাও। কিন্তু, কেন বিদায় চাই, সেও কি জানতে পারবনা ?” রমা মৌন হইয়া রহিল। রমেশ পুনরায় কহিল,—“কেন যে তোমার সমস্ত কথাই লুকিয়ে রেখে চ'লে গেলে, সে তুমিই জানো। কিন্তু আমিও কারমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, একদিন যেন-তোমাকে সর্কাস্তঃকরণেই ক্ষমা করিতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে না পারায় যে আমার কি ব্যথা, সে শুধু আমার অন্তঃকাম্যমুখী জানেন।” রমার দুই চোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল করিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু, সেই অত্যন্ত মুহূ-আলোকে রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। রমা নিঃশব্দে দূর হইতে তাহাকে আর একবার প্রণাম করিল, এবং পরক্ষণেই রমেশ স্বর হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার সমস্ত কাজকর্মের উৎসাহ যেন এক নিমেষে, এই জ্যোৎস্নার মতই অস্পষ্ট-ছায়াময় হইয়া গেছে।

পরদিন সকালবেলায় রমেশ এ বাড়ীতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন বিখেরদ্বারী বাত্মা করিয়া পাকিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রমেশ দ্বারের কাছে মুখ লইয়া অশ্রু-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল,—“কি অপরাধে আমাদের এত শীঘ্র ত্যাগ ক'রে চলল জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী ডানহাত বাড়াইয়া রমেশের মাথার রাখিয়া বলিলেন,—  
 “অপরোধের কথা বলিতে গেলে ত শেষ হবে না বাবা। তার কাজ  
 নেই।” তার পরে বলিলেন,—“এখানে যদি মরি রমেশ, বেশী  
 আমার মুখে আশ্রয় দেবে। সে হ’লে, ত কোমরতেই মুক্তি পাব  
 না। ইহকালটা ত জলে জলেই গেল’ বাবা, পাঁছে পরকালটাও  
 এমনি জলে-পুড়ে মরি, আমি সেই ভয়ে পালাচ্ছি রমেশ।” রমেশ  
 বজ্রহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। আজ এই একটি কথার সে  
 জ্যাঠাইয়ার বৃকের ভিতরটার জননীর জালা যেমন করিয়া দেখিতে  
 পাইল, এমন আর কোনদিন পায় নাই। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া  
 থাকিয়া কহিল,—“রমা কেন যাচ্ছে জ্যাঠাইবা?” বিশ্বেশ্বরী  
 একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন সংবরণ করিয়া লইলেন। তার পরে  
 গলা খাটো করিয়া বলিলেন,—“সংসারে তার যে স্থান নেই, বাবা,  
 তাই তাকে ভগবানের পায়ে নৌচেই নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে  
 গিয়েও সে যাচ্ছে কি না জানিনে। কিন্তু, যদি যাচ্ছে, সারা জীবন  
 ধরে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন  
 ভগবান্ তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে  
 পাঠাইয়া ছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই ছুংখের বোঝা  
 মাথা দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। এ কি অর্থ-  
 পূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না, এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের  
 খেলা। ওরে রমেশ, তার মত ছুংখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নাই।”  
 বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাকে এতখানি  
 ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই। রমেশ স্তব্ধ  
 হইয়া বসিয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরী, একটু গায়েই কহিলেন,—“কিন্তু,  
 তার ওপর আমার এই আদেশ বহিল রমেশ, তাকে তুই যেন ভুল  
 খুসিসনে। বাবার সময় আমি কারো কিকছুে কোন নাশি ক’রে  
 যেতে চাইনে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনো অবিশ্বাস  
 করিসনে যে, তার বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষণী তোর আর কেউ নেই।”

রমেশ বলিতে গেল,—“কিন্তু, জ্যাঠাইমা—” জ্যাঠাইমা তাকাতাকি  
বাক্য দিয়া বলিলেন,—“এর মধ্যে কোন ‘কিন্তু’ নেই রমেশ। তুই  
যা’ শুনেছিস্, সব মিথো; যা’ জেনেছিস্, সব ভুল। কিন্তু, এ  
অভিযোগের এইখানেই যেন সমাপ্তি হয়। তোর কাজ যেন সমস্ত  
অত্যাচার, সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ ক’রে চিরদিন এমনি  
প্রবল হ’য়ে ব’য়ে যেতে পারে, এই তোর ওপর তার শেষ  
অনুরোধ। এই জন্যই সে মুখ-বুজে সমস্ত সহ্য ক’রে গেছে।  
প্রাণ দিতে বসেচে, রে রমেশ, সবু কথা করনি।” গতরাত্রে রমার  
নিজের মূখের দুই একটা কথাও রমেশের সেই মুহূর্তে মনে পড়িয়া  
হুজুয় রোদনেব বেগ যেন ওঠে পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি  
মুখ নীচু করিয়া প্রাণপণ-শ্রদ্ধিতে বলিয়া ফেলিল,—“তাকে  
বোলো জ্যাঠাইমা, তাই হবে।” বলিয়াই হাত বাড়াইয়া কোন  
মতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সম্পূর্ণ



## আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

সংস্করণবাসীদেব স্ববিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করাইবে; গ্রাহক-  
দিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক, ভি: পি: ডাকে ৥৮/০ মূল্যে  
প্রেরিত হইবে; প্রকাশিতগুলি একত্র বা পত্র লিখিয়া স্ববিধাঙ্ক-  
বাসী পৃথক পৃথক লইতে পারেন। গ্রাহকদিগের কোন বিবরণ  
জানিতে হইলে, “গ্রাহক-নম্বর” সহ পত্র দিতে হইবে।

- ১। অভাগী ( ৫ সংস্করণ )—শ্রীজলধর সেন।
- ২। ধর্মপাল ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ।
- ৩। পল্লী-সমাজ ( ৬ষ্ঠ সংস্করণ )—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ৪। কাকনমালা ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্. এ।
- ৫। বিবাহ বিপ্লব ( ২য় সং )—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্. এ, বি, এল্।
- ৬। চিত্রালী ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীমুখীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ৭। দর্শাদল ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
- ৮। শান্ত ভিখারী ( ২য় সং )—শ্রীবাধকমল মুখোপাধ্যায় এম্. এ।
- ৯। বড়বাড়ী ( ৩য় সংস্করণ )—শ্রীজলধর সেন।
- ১০। অবক্ষণীয়া ( ৪র্থ সংস্করণ )—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ১১। মধুখ ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ।
- ১২। সত্য ও মিথ্যা ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
- ১৩। রূপের বালাই ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীহরিনাথন মুখোপাধ্যায়
- ১৪। সোণার পদ্ম ( ২য় সং )—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ।
- ১৫। লাইকা ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীমতী হেমলিনী দেবী।
- আলোয়া—( ২য় সংস্করণ ) শ্রীমতী নিকুপমা দেবী।
- বেগম সমরু—( সচিএ ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- নকল পাড়াবী ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
- বিষদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
- হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী।
- মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
- নীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি, এ, বি এল্।
- ১৬। স্বপ্নের ঘর ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম্. এ।
- ১৭। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
- ১৮। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাকনমালা দেবী।

- ২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।  
 ২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।  
 ২৮। সৌমন্ত্রিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।  
 ২৯। নব্য-বিজ্ঞান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ।  
 ৩০। নব-বর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।  
 ৩১। নৌলমণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।  
 ৩২। হিসাব-নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল।  
 ৩৩। মাঘের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।  
 ৩৪। ইংবেজী কাব্য-কথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।  
 ৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।  
 ৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।  
 ৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।  
 ৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই।  
 ৩৯। হরিশ ভাগুরী—শ্রীজলধর সেন।  
 ৪০। কোন পথে—শ্রীকালিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।  
 ৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ।  
 ৪২। পল্লীরাজি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।  
 ৪৩। ভবানী—নিতাকৃষ্ণ বসু।  
 ৪৪। অমির উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।  
 ৪৫। অপরিচিতা—শ্রীপারুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।  
 ৪৬। প্রত্যাবর্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।  
 ৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—ডঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এ  
 ৪৮। ছবি—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।  
 ৪৯। মনোরমা—শ্রীসরসীবালা বসু।  
 ৫০। সুরেশের শিকার—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।  
 ৫১। নাচ ওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ।  
 ৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ  
 ৫৩। গৃহহারী—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ( বঙ্গবন্ধু )

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা